[illegible]

সম্পর্কের ভাই আছেন, তিনি সওদাগরী আফিসের কেরাণী। স্বর্ণেন্দু যখন কথাবার্ত্তা কহিত তখন মেজমামার নাম করিত বারংবার, মেশোর নাম করিত মাঝে মাঝে, ভাইয়ের নাম একবারও না। ভাই যে কেরাণী—তার নাম কি করা যায়—আরে ছোঃ! এইজন্য স্বর্ণেন্দুর আড়ালে সকলে তাহাকে 'মেজমামা' বলিয়া ডাকে।

অবনী পা নাচাইতে নাচাইতে বলিল, "আজকাল দেশে একদল ছোক্‌রা দেখি, 'রবি-ঠাকুর রবি-ঠাকুর' করে' তারা অজ্ঞান। ঐ চ্যালাদের অতি-ভক্তির ঠ্যালায় আমরা ত অস্থির হয়ে উঠলুম মশাই! আমাদের জয়ন্তবাবুর যদি একটুও রসবোধ থাক্‌ত, তাহ'লে তিনি রবিবাবুর এমন অন্ধ নির্লজ্জ গোঁড়ামী করতে পার্‌তেন না। আমি কিন্তু—" হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়া অবনী থতমত খাইয়া একসঙ্গেই পা-নাচানো এবং রবিবাবুর সমালোচনা বন্ধ করিয়া ফেলিল, তারপর তাড়াতাড়ি স্বর বদলাইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে জয়ন্তবাবু! আসুন—আসুন, এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল যে!"

জয়ন্ত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি আস্‌তে-আস্‌তেই সব শুন্‌তে পেয়েছি।"

জগৎবাবু আলবোলার নল ফেলিয়া বলিলেন, "দেশ থেকে কবে ফির্‌লে হে?"

জয়ন্ত বলিল, "আজ সকালে।……তারপর অবনীবাবু, আপনি গোঁড়ামী আর রসবোধের কথা কি বল্‌ছিলেন না?"

অবনী দু'টো ঢোঁক গিলিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, না, এমন-কিছু নয়—এমন-কিছু নয়।"

কৈলাসবাবু নাকে কোঁচার খুঁট ঢুকাইয়া হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করিয়া দু'বার হাঁচিয়া, দুষ্টামি-মাখানো হাসি হাসিয়া বলিলেন, "জয়ন্তবাবু,

অবনীবাবু বল্‌ছিলেন যে রবিবাবু কবি নন, আর আপনার রসবোধ নেই, আর—"

অবনী রাগে গস্‌গস্‌ করিতে-করিতে হুম্‌কি দিয়া উঠিল, "বল্‌ছিলুম ত বল্‌ছিলুম,—তাতে হয়েছে কি ?"

জয়ন্ত রাগ সাম্‌লাইয়া বলিল, "না, এমন-কিছু হয়-নি! তবে কি জানেন, আপনার দু'টি মতই ভ্রান্ত!"

—"ভ্রান্ত কিসে ?"

—"অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, আর, আমার রসবোধ আছে!"

—"মহাকবি! যিনি মহাকাব্য লেখেন নি, তিনি মহাকবি!"

জয়ন্ত কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, এমন সময় চাকর আসিয়া টেবিলের উপরে খাবারের থালা আনিয়া রাখিল।

অম্‌নি কৈলাসবাবু হাঁচি থামাইয়া টপ্‌-করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং শূন্যে দু'হাত তুলিয়া বলিলেন, "শান্ত হোন, শান্ত হোন, আপনারা শান্ত হোন! খাবার-ভরা থালা যখন সাম্‌নে এসে অপেক্ষা করে, তখন হাত-গুটিয়ে মুখবন্ধ করে' তর্ক শোন্‌বার ধৈর্য্য আমাদের নেই! অতএব—"

অতএব কৈলাসবাবু অতুল উৎসাহে বিপুল ভুঁড়িটি দুলাইয়া এবং সাগ্রহে দুই থাবা পাতিয়া খাবারের থালাকে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করিলেন।

তিন

জগৎবাবুর বাড়ীর পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে।

সেইখানে একখানি লোহার বেঞ্চির উপরে বসিয়া জগৎবাবুর বড় মেয়ে ইন্দুলেখা আপনমনে গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছিল। এমন-সময়ে পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া সে গান বন্ধ করিল। পিছন না-ফিরিয়াই বলিল, "কে ?"

—"আমি।"

"কে জয়ন্তবাবু ?"—বলিয়াই ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

—"হ্যাঁ, আমি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম।"

—"দেশ থেকে কবে এলেন ?"

—"আজ সকালে।"

—"ভালো আছেন ত ?"

—"হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ ইন্দু ?"

—"ভালোই আছি! বসুন।"

জয়ন্ত বেঞ্চির একপাশে গিয়া বসিল।

ইন্দুলেখার গড়নটি ছিপ্‌ছিপে—সাধারণ বাঙালী স্ত্রীলোকের তুলনায় সে একটু দীর্ঘাকার—কিন্তু সে দীর্ঘতা তাহার দেহ-খানিকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ছোট্ট কপালখানির উপরে একরাশি কোঁকড়া চুল নাচিয়া-নাচিয়া উঠিতেছে। ভুরু-দু'খানি যোড়া—যেন এতটুকু একখানি ছবির ধনুকের মতন। ঘনপল্লবের মাঝে উজ্জ্বল ও আয়ত দু'টি চোখ—তার দৃষ্টি এমন চঞ্চল, যে দেখিলেই মনে হয়, এ যেন

কালো মেঘের মধ্যে রহিয়া-রহিয়া যুগল বিদ্যুতের চমক! ঠোঁটদু'খানি পাত্‌লা, যেন রক্ত-কমলের হাল্‌কা পাপ্‌ড়ি! চিবুকের উপরে একটি তিল —যেন তার চোখের তারা আঁকিবার সময়ে বিধাতার তুলির মুখ হইতে একতিল কালি এখানে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে! বাহুদু'খানি নধর-নিটোল, সে পেলবতার তলায় কঠিন হাড়'আছে বলিয়া বোঝাই যায় না। ইন্দুর গায়ের রংটিও অপূর্ব্ব,—যেন ভোরের আকাশ হইতে খানিকটা গোলাপী আভা ছানিয়া আনিয়া কে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছোবাইয়া দিয়াছে।······

জয়ন্তের পাশে বেঞ্চির উপরে বসিয়া ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি ত দেশে গিয়ে বেশ দিনকতক কাটিয়ে এলেন, আমার কিন্তু এখানে আর মন টিঁকছে না। বাবাকে এত করে' বল্‌ছি দিনকতক আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে, তা যাচ্চি-যাব করে' এস্তানাগাৎ তাঁর যাওয়া আর হোলই না! কল্‌কাতা ছাড়্‌তে তাঁর গায়ে যেন জ্বর আসে—বাবা বাবা, এমন মানুষ আর ত দেখি-নি!"

—"হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে মনের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরেরও উন্নতি হয়।"

ইন্দু তাহার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র পা-দু'খানি ঘনসবুজ ঘাসের উপরে দুলাইতে-দুলাইতে বলিল,—"আপনি বেশ আছেন জয়ন্তবাবু, কল্‌কাতা যদি একঘেয়ে লাগে অম্‌নি দেশে পালিয়ে যেতে পারেন! আমাদেরও দেশ আছে, শুনেছি সেখানে নাকি মস্ত তিন-মহল বাড়ীও আছে, কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত সব রূপকথার মত শুনেই আস্‌ছি—কিছু চোখে দেখা আর হয়ে উঠল না।"

—"কেন, ইচ্ছে করলেই ত সেখানে তোমরা যেতে পার!"

—"ওরে বাস্‌ রে, কার এমন সাধ্যি আছে বাবাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে! দেশের নাম না-কর্‌তেই বাবা ভয়ে একেবারে আঁৎকে

উঠ্‌বেন—চোখ কপালে তুলে বল্‌বেন, সেখানে ঘরে আছে ম্যালেরিয়ার জাগ্রত মশা, বাইরে আছে গোখ্‌রো সাপ আর পুকুরের জলে আছে কলেরার বীজ !”

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তোমার বাবার অম্‌নি-কতকগুলো ছিট্‌ আছে বটে! আর সুধু তিনি কেন, তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে তোমা-দেরও ঐ-সব বাতিকে ধরেছে !”

—“কিন্তু জয়ন্তবাবু, পাড়া-গাঁ আমার এত ভালো লাগে যে, কি আর বল্‌ব।”

—“কখনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক-নি, তাই একথা বল্‌ছ—সেখানে গিয়ে থাক্‌তে হোলে দু'দিনেই অরুচি ধরে যেত !”

নাক নাড়িয়া খোঁপা দুলাইয়া চোখ নাচাইয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, তা বৈকি, কখ্‌খনো অরুচি ধর্‌ত না ! অনেকদিন আগে রেলগাড়ী করে' আমরা একবার গিরিডি গিয়েছিলুম। পথে যেতে-যেতে দু'ধারে কত যে পাড়া-গাঁ দেখ্‌লুম ! কোথাও-বা মাঠের ধারে গ্রাম, কোথাও বা নদীর ধারে, কোথাও-বা সবুজ গাছপালা ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতরে ! কত সব কুঁড়ে ঘর—পাতা আর খড়ে গড়া, ছোট্ট-ছোট্ট, তাদের আশেপাশে কলাগাছের নিশান উড়ছে, কত-সব তাল-নারকেল-খেজুর গাছ, বাঁশ-বনের ঝুপ্‌সী ছায়ার তলায় পুকুর-ঘাটে কেমন জল থৈ-থৈ করছে, গাঁয়ের মেয়েরা সেখানে কল্‌সী-কাঁখে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, কত সব ছোট-ছোট আঁকাবাঁকা পথ—তার কোনটি গাঁয়ের ভিতরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, কোনটি বা মস্ত মাঠের মধ্যে কে-জানে কোথায় কোন্‌দেশে চলে গেছে! সত্যি জয়ন্তবাবু, আমার ভারি ইচ্ছে করে, সেই পথ ধরে ধূ-ধূ-করা মাঠের মধ্যিখানে রাখালের বাঁশীর গান শুন্‌তে-শুন্‌তে খালি ছুটি আর ছুটি আর ছুটি !”

জয়ন্ত হাস্যমুখে ইন্দুর এই উচ্ছ্বাসভরা প্রাণের কথা চুপ্‌চাপ শুনিয়া যাইতেছিল। সে থামিলে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যখন গাছপালা এতোই ভালবাস, তখন তোমার এই বাগানটি যাতে নানারকম গাছে ভ'রে ওঠে, এবার থেকে আমি সেই চেষ্টা কর্‌ব।"

এমন সময় জগৎবাবু সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন। তাহাদের দু'জনকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝি এইখানে অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছ? আর আমি সারা-বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

ইন্দু বলিল, "এমন চাঁদের আলোতে তুমি অন্ধকার দেখ্‌চ বাবা!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চাঁদের আলো ছাখ্‌বার বয়স আর কি আমার আছে মা! নে, উঠে পড়্‌—এস জয়ন্ত, ঘরের ভিতরে এস!"

জয়ন্ত উঠিয়া বলিল, "বাইরের ঘর থেকে ওঁরা সব চলে গেছেন নাকি?"

—"হ্যাঁ, আজ একটু সকাল-সকাল আসর ভেঙে গেছে।"

সকলে বাড়ীর ভিতরে একটি ঘরে গিয়া বসিলেন।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জগৎবাবু বলিলেন, "এর-মধ্যে ন'টা বেজে গেছে! ইন্দু, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল, জয়ন্ত আজ এইখানেই খেয়ে যাবেন।"

জয়ন্ত বলিল, "না, আজ থাক্‌—বাসায় খাবার তৈরি হয়েছে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না-হয় সেগুলো আজ ফেলাই যাবে!"

একটু পরে জগৎবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খাইতে বসিল। ইন্দুলেখা পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইন্দু তখন কতকগুলি আম ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল।

জগৎবাবুর পাতে আম ও মিষ্ট দিয়া ইন্দু যেম্‌নি জয়ন্তের পাতে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, জগৎবাবু অম্‌নি হাঁ-হাঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ইন্দু, দিস্‌-নে—দিস্‌-নে।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি হাত গুটাইয়া লইল। জগৎবাবু রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হাঁকিলেন, "ঠাকুর! শীগ্‌গির এদিকে এস!"

রাঁধুনি-বামুন যখন আসিল, তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আম আজ সিদ্ধ কর-নি কেন?"

মুখ চূণ করিয়া বামুন বলিল, "আজ্ঞে, ভুলে গেছি!"

—"ভুলে গেছ! লোককে প্রাণে মার্‌বার ফিকির, না?"

কথাটা এই। জগৎবাবু আম প্রভৃতি ফল আগে একবার গরমজলে না-ডুবাইয়া খাইতেন না! পাছে কোনরকম রোগের 'জার্ম' বা বীজ বিনা-নোটিসে শরীরে ঢুকিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই তটস্থ হইয়া থাকিতেন! যে সব ফল সিদ্ধ করা চলিত না, সে-সব তিনি নিজেও খাইতেন না এবং বাড়ীর আর কারুকেও খাইতে দিতেন না। বাজারের কোন মিষ্টান্নও এ বাড়ীতে কেউ খাইতে পাইত না—পাছে কোন সংক্রামক ব্যাধি সেই ফাঁকে দেহের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া বসে!

যাহা হোক,—বাবুর হাতে-পায়ে ধরিয়া বামুনের চাকরিটি সে যাত্রা টিঁকিয়া গেল বটে, জয়ন্তের ভাগ্যে সেদিন কিন্তু আম খাওয়া আর হইল না।

জগৎবাবুও পাতের আম পাতেই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন; চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে, এখনি হয়েছিল আর কি, ও আম খেলে আর দেখ্‌তে-শুন্‌তে হোত না—ও কি আম, ও যমালয়ে যাবার পরোয়ানা। বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে জয়ন্ত!"

বহুকষ্টে হাসির বেগ সাম্‌লাইয়া জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তবে আসি!"

ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, কাল একটু সকাল-সকাল আস্‌বেন।"

ইন্দুর হাত হইতে পাণ লইয়া জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা।"

... ...

আজ বছরখানেক হইল, জয়ন্তের সঙ্গে জগৎবাবুদের আলাপ হইয়াছে। বাসা বদ্‌লাইয়া জয়ন্ত যে নূতন বাড়ীখানি ভাড়া করে, সেখানি ঠিক জগৎবাবুর বাড়ীর সাম্‌নেই, এ ফুটপাথের উপর।

জয়ন্ত গান-বাজ্‌না বড় ভালোবাসিত। সে যখন হারমোনিয়মের সঙ্গে গান ধরিত, কিংবা আপন মনে বাঁশী বাজাইত, তখন রাস্তার উপরে লোকের পর লোক জমিয়া যাইত। এমন মিষ্ট গান বা এমন চমৎকার বাজ্‌না সহজে যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। সে সুরের মন্ত্রে মরামানুষও যেন জাগিয়া উঠে।

সাম্‌নের বাড়ীর জগৎবাবুর কাণেও সে সুর গিয়া পৌঁছিল। বাঙ্‌লা-দেশে পাড়ায়-পাড়ায় হামেসা যে-রকম গান-বাজ্‌না হয়, কাণের পোকা বাহির করা ছাড়া তার আর-কিছু সার্থকতা থাকে না;—এমন-কি, সময়ে-সময়ে পুলিস ডাকিয়া পল্লীবাসী তানসেনদের স্তব্ধ করিতে না-পারিলে প্রাণ-বাঁচানো শক্ত হইয়া উঠে! কিন্তু জয়ন্তের গানে এ বিভীষিকা ছিল না!

অতএব, কৌতুহলী জগৎবাবু এর-তার মুখ হইতে খোঁজ লইতে লাগিলেন, এই গীতসিদ্ধ যুবকটি কে!...শুনিলেন, সে মফঃস্বলের এক জমিদারের ছেলে, কলিকাতার কোন কলেজে এম-এ পড়ে এবং তাঁহাদেরই স্বজাতি।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায়, জয়ন্তের বাঁশী পূরবীর উদাস সুরে

ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে, হঠাৎ জগৎবাবু আসিয়া তাহার বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।

বাজ্না থামাইয়া জয়ন্ত বলিল, "আসুন, বসুন।"

জগৎবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আমি সাম্নের বাড়ীতেই থাকি—আপনার বাজ্না আজ আমাকে বাড়ী থেকে এখানে টেনে এনেছে।"

একটু হাসিয়া জয়ন্ত তার বাঁশীতে আবার ফুঁ দিল। জগৎবাবু চোখ বুঁজিয়া তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বাঁশীর রাগিণী আবার বাজিতে লাগিল—কখনো উর্দ্ধে, কখনো নিম্নে, কখনো কড়িতে, কখনো কোমলে। বিভোর হইয়া অনেকক্ষণ বাজাইয়া জয়ন্ত যখন থামিল—জগৎবাবুর মাথা-নাড়াও তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এবং মুখখানি বুকের উপরে একপেশে হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত ছু'-একবার ডাকিয়া সাড়া না-পাইয়া বুঝিল, তাহার এই অপূর্ব্ব শ্রোতাটি এখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন!

পরদিনই জগৎবাবু আসিয়া জয়ন্তকে নিজের বাড়ীর আসরে জোর-জার করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার গানে আর বাজ্নায় সেদিনকার আসরটি একেবারে জম্জমাট্ হইয়া উঠিল।

কিছুদিনের আলাপ-পরিচয়েই জগৎবাবু বুঝিলেন যে, এই যুবকটি সুধু রূপ, অর্থ ও বিদ্যা সম্পদেই ধনী নয়, চরিত্র-সম্পদে এবং হৃদয়-ধনেও তাহার সমকক্ষ সহজে মেলা তুর্ঘট।...তিনি জয়ন্তকে অনুরোধ করিলেন, ইন্দুলেখাকে গান শিখাইবার জন্য। জয়ন্তেরও তাতে অমত হইবার কোন হেতু ছিল না।

এম্নি-করিয়া জয়ন্তের সঙ্গে এই পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতায় একজনের চোখ বিষম টাটাইতে লাগিল ; সে অবনী।

অবনী জগৎবাবুরই এক প্রতিবেশী। তাহার বাপ দালালী করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা অত্যন্ত অসামান্য না-হইলেও নিতান্ত সামান্য নয়। তার উপরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপ পাওয়াতে বিয়ের বাজারে অবনীর পসার বাড়িয়া গিয়াছিল যৎপরোনাস্তি। আজকাল বড়-বড় ঘর হইতে তাহার যে-সমস্ত সম্বন্ধ আসিতেছে—তাহাতে সম্মতি দিলে সে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকন্যা না-পাইলেও, একটি রূপসী মেয়ে এবং অন্তত হাজার-দশেক টাকা অনায়াসে হাতাইতে পারে! কিন্তু রাঙা বউ এবং চক্‌চকে টাকার প্রতি যথোচিত টান্ থাকিলেও এ-সব সম্বন্ধে সে একেবারেই গা করিতেছে না।

জগৎবাবুর একটি মস্ত গুণ ছিল,—ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই তিনি সমান ভাবে মিশিতে পারিতেন। তাই বয়সে অনেক ছোট হইলেও অবনীর সঙ্গে তাঁহার মেলা-মেশায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। অন্য সকলে যেমন যায়, অবনীও তেম্‌নি নিয়মিতরূপে জগৎবাবুর বন্ধুসভায় গিয়া হাজির হইত।

পর্দ্দা খাটাইয়া এবং পাঁচিল গাঁথিয়া অন্তঃপুরের নারীদের অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া তুলিতে জগৎবাবুর যথেষ্ট আপত্তি ছিল সত্য ; কিন্তু তা-বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে সকল বন্ধুকেই ঢুকিতে দিতেন না। তাঁহার যে দু'-চারজন বাছা-বাছা বন্ধুর এ সৌভাগ্য ছিল, অবনীও তাহাদের একজন।

অবনীর মুখের এবং বুকের আধখানা যুড়িয়া যে অত্যন্ত-গম্ভীর দাড়ির অরণ্য, তাহার মধ্যে যে কোনরকম কোমল বৃত্তি বাসা বাঁধিতে পারে, এটা চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠা ভারি শক্ত ছিল। কাজে-কাজেই জগৎবাবু

একদিনও এমন সন্দেহ মনে আনেন নাই, তাঁহার কন্যা ইন্দুলেখাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক!

অবনী এখনো মুখ ফুটিয়া জগৎবাবুর কাছে তাঁহার কন্যার পাণি-পীড়নের প্রস্তাব দাখিল না-করিলেও প্রায়ই জগৎবাবুকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিত, "অমুক জমিদার মেয়ে নিয়ে তাকে ভারি সাধাসাধি কর্‌ছে। অমুক ডেপুটি তাকে এত টাকা আর নিজের একমাত্র মেয়েকে দিতে প্রস্তুত। সে কিন্তু রাজি নয়।"—ইত্যাদি।

জগৎবাবুও মনে মনে ভাবিতেন, 'এ লোকটির পক্ষে বিবাহ করার চেয়ে না-করাই হচ্ছে পরম স্বাভাবিক; কেননা এ-হেন দাড়ির আবির্ভাবে বাসর-ঘরে বিদ্রোহ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা।' কিন্তু এমন ভালো-ভালো সম্বন্ধে অবনীর এতটা অরুচির আসল কারণ যদি জগৎবাবু বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতেন!

যাহা হোক্—এম্‌নি ভাবে দিন যাইতেছিল; কিন্তু এর-মধ্যে আচম্বিতে জয়ন্তের আগমনে সমস্তই ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। কারণ, প্রথমত—কথাবার্ত্তায়, গানে-বাজ্‌নায় জয়ন্ত একেবারে আসর জম্‌কাইয়া তুলিয়াছে; দ্বিতীয়ত—জয়ন্তের প্রতি জগৎবাবুর পক্ষপাতিতা ক্রমেই চরমে উঠিতেছে; তৃতীয়ত এবং প্রধানত—ইন্দুলেখাও যেন জয়ন্তকে অত্যন্ত পছন্দ করে বলিয়া সন্দেহ হয়।

—অতএব, জয়ন্তের উপরে অবনী হাড়ে-হাড়ে চটিয়া গেল।

চার

পরদিন হইতেই জয়ন্ত ইন্দুলেখার উদ্যান-রচনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। এবং মাসদুয়েকের ভিতরেই সে নূতন-নূতন ছোট-বড় দেশী-বিলাতী নানারকমের ফুলের গাছ আনাইয়া, সেই পোড়ো জমিটাকে চমৎকার একটি বাগানে পরিণত করিয়া ফেলিল।

সেদিন জয়ন্ত বাগানের এককোণে কতকগুলি কলাগাছ পুঁতিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় ইন্দুলেখা আসিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, বাগান ত হোল,—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মত এখানে যে পাখি-টাখি ডাকে না, তার কি হবে?"

জয়ন্ত বলিল, "সে আর এমন বেশী কথা কি!"

তারপরদিনেই জয়ন্ত টেরিটিবাজারের চিড়িয়াখানা প্রায় খালি করিয়া আনিল। মণিয়া, শ্যামা, কেনেরি, টিয়া, কাকাতুয়া, নীলমন, ময়না, ময়ূর—সে যে কত জাতের কত পাখী তা আর গুণতিতে আসে না।

তাদের কিচিরমিচির শুনিয়া জগৎবাবু মহা বিস্ময়ে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ইন্দুলেখা তখন খুসি হইয়া বালিকার মত হাততালি দিয়া নাচিতেছে!

জগৎবাবু সহাস্যবদনে আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ইন্দুলেখার হাসি-খুসি দেখিলেন। তারপর আগাইয়া গিয়া বলিলেন,—"ইন্দু, তোমার নাচ থামাও—তুমি এখন কচি খুকিটি নও!"

ইন্দু ছুটিয়া গিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা—বাবা, কত পাখি ছাখ!"

—"তাইত, এত পাখি এল কোত্থেকে ?"

—"কেন, জয়ন্তবাবু আমাকে উপহার দিয়েছেন যে ! তা বুঝি জান না ?"

জয়ন্তের দিকে ফিরিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "খাম্‌কা তুমি এতগুলো টাকা নষ্ট করতে গেলে কেন বল দেখি ?"

—"ইন্দু যে পাখির গান শুন্‌তে চায় !"

—"ও পাগ্‌লী যদি আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে তুমি তাও এনে দেবে নাকি ? না না, সে হবে না—তোমার কত খরচ হয়েছে বল, আমি এখনি দিয়ে দেব !"

জয়ন্ত কিন্তু তাঁহার কথা কাণেই তুলিল না।

কৃত্রিম পাহাড়ের ঝরণার সাম্‌নে পাখিদের মস্ত একটা খাঁচা তৈরি করা হইল। তাহার ভিতরে কতক পাখি রহিল—বাদবাকি রহিল গাছে-গাছে টাঙানো খাঁচায়।

পাখিদের জন্য বন্দোবস্ত শেষ হইল—কিন্তু ইন্দুলেখার মন তবু উঠিল না। মুখভার করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, এখন বর্ষা পড়েছে—এ সময়ে ব্যাং না ডাক্‌লে এ-জায়গাটা ঠিক পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ বলে মনে হবে না ত !"

জয়ন্ত মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ব্যাং ত বাজারে কিন্‌তে মেলে না ইন্দু !"

ইন্দুলেখা বলিল, "তাহ'লে কি হবে ! আমার কিন্তু ব্যাং চাই-ই চাই !"

জয়ন্ত খানিক ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে ! গোলদিঘিতে খুব ব্যাং ডাকে ! সেখানে গিয়ে ঝুলি বোঝাই করে' ব্যাং ধরে আন্‌লেই হবে,—কি বল ?"

তারপরদিন বাগানে যখন ঝুলি খুলিয়া ব্যাং ছাড়া হইতেছে, অবনী আসিয়া হাজির। রাশিরাশি কোলা ব্যাং দেখিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল,—অ্যাঁ—"অ্যাঁ, একি কাণ্ড!"

পাছে দু'-একটা ব্যাং গায়ে লাফাইয়া পড়ে, সেই ভয়ে ইন্দুলেখা তখন একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইখান হইতেই সে বলিল, "অবনীবাবু, পাড়াগাঁয়ের মত এখানেও যাতে ব্যাং ডাকে, তারি বন্দোবস্ত হচ্ছে।"

—"কিন্তু এত ব্যাং এল কোত্থেকে?"

—"কোত্থেকে আবার! গোলদিঘি থেকে!"

—"বুঝেছি, এ জয়ন্তবাবুর কাণ্ড!"

—"না, আমি বলেছি বলেই উনি ব্যাং আনিয়েছেন; তা-নইলে পাড়াগাঁয়ের ঠিক ভাবটি ফুটবে কেন?"

অবনী টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "বাঃ জয়ন্তবাবু, বাঃ! কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সুধু তঁ ব্যাং থাকে না—সাপ, বিছে, বাদুড়, শেয়াল এগুলিও যে পাড়াগাঁয়ের পুরণো বাসিন্দা। তাদেরও এখানে নেমন্তন্ন করে' আসুন—নৈলে মানাবে কেন?"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "মনুষ্যসমাজে ও-জীবগুলি যে কল্‌কে পায় না অবনীবাবু! ওদের সঙ্গে আমাদের কারবার নেই—কাজেই ইন্দুলেখার বাড়ীতেও তাদের নেমন্তন্ন বন্ধ!"

—"আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি।"

—"ভয় পাবেন না অবনীবাবু, ভয় পাবেন না—অকারণে ভয় পাওয়াটাই হচ্ছে বেঠিক মাথার লক্ষণ!"

—"আপনার সব-তাতেই মৌলিকতা! বাগান কর্‌তে চান বাগান

করুন—তার মধ্যে এত ফ্যাচাং কেন মশাই! বাগান ত আমারো আছে—কিন্তু তা ব্যাঙে ভরাও নয়, এমন উঁচু-নিচুও নয়।"

—"উঁচু-নিচুর কথা বলছেন? বাগানের জমি উঁচু-নিচু করাই ত উচিত, নৈলে বাহার হবে কেন? যে-কোন ভালো বাগান বা বাগান-সম্বন্ধে লেখা বই দেখ্‌লেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন।"

অবনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বেশ মশাই, বেশ। আপনার মত আমি ত সকল বিষয়ে পণ্ডিত নই, অত-শত জানি না!"

ইন্দুলেখা এতক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকিয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, একটা গলা-ফোলা মস্তবড় কোলা-ব্যাং লুকাইবার ঠাঁই না-পাইয়া অবনীর লম্বা কোঁচার ভিতরে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে!

সে মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, "অবনীবাবু, আপনার কোঁচার ভেতরে একটা ব্যাং গা-ঢাকা দিয়েছে।"

অবনী তড়াক্ করিয়া একটা লাফ মারিয়া, পিছনে হটিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "ছি ছি, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে!" সে আর দাঁড়াইল না—বারংবার কোঁচা ঝাড়িতে ঝাড়িতে চোঁচা সরিয়া পড়িল।

যাইতে-যাইতে শুনিতে পাইল, জয়ন্ত ও ইন্দু পিছন হইতে হো-হো করিয়া হাসিতেছে!

* * * * *

জগৎবাবুর বাহিরের ঘর হইতে একে একে সবাই যখন উঠিয়া গেল, অবনী তখনো নড়িল না।

জগৎবাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, রাত নয়টা বেজে গেছে—আজকের মত আসর ভঙ্গ করা যাক্—কি বলেন?"

অবনী একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দরজার দিকে খানিক

আগাইয়া গেল। আলবোলার নল ফেলিয়া জগৎবাবুও উঠি-উঠি করিতেছেন—হঠাৎ অবনী ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

জগৎবাবু অবাক হইয়া অবনীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জগৎবাবু!"

—"বলুন।"

—"দেখুন, আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি এও চাই যে, সে শিক্ষাটা যেন কুশিক্ষা না-হয়ে ওঠে!"

—"আপনি হঠাৎ এ-কথাটা তুল্‌লেন কেন বলুন দেখি!"

—"কারণ আছে। আমি যা বল্‌লুম, সেটা সঙ্গত কিনা?"

"হ্যাঁ, খুবই সঙ্গত। কিন্তু অবনীবাবু, অসময়ে অকারণে কোন প্রসঙ্গ তুল্‌লে, তা সঙ্গত হলেও শুন্‌তে অসঙ্গত হয়।"

—"তাহ'লে কারণটা শুনুন। কাল বৈকালে আমি যখন আপনার বাড়ীতে এসেছিলুম, শুনলুম জয়ন্তবাবু আপনার মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন।"

—"বেশত, তাতে হয়েছে কি! আপনি কি মেয়েদের গান শেখানো অন্যায় বলে মনে করেন?"

—"নিশ্চয় করি না!"

—"তবে?"

—"কিন্তু মেয়েদের অশ্লীল গান শেখালে আমি সেটা অন্যায় মনে করি!"

—"অশ্লীল গান? তার মানে?"

—"জয়ন্তবাবু আপনার মেয়েকে এমন একটা কুরুচিপূর্ণ গান শেখাচ্ছিলেন, যা কোন ভদ্রমহিলারই গাওয়া উচিত নয়!"

জগৎবাবু বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"এ যদি সত্য হয় তাহ'লে জয়ন্তের অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বল্‌তে হবে।"

—"আমি স্বকর্ণে শুনেছি জগৎবাবু—এ মিথ্যা হ'তে পারে না। গানটা রবীন্দ্রনাথের।"

—"রবীন্দ্রনাথের গান অশ্লীল!"

"গানটা শুন্‌লেই আপনি বুঝতে পার্‌বেন। তার কথাগুলো এই—

তুমি যেওনা এখনি,
এখনো আছে রজনী।
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক তরু-গহন
আঁধার ধরণী—

—প্রভৃতি। এর মানে কি? অর্থাৎ একটা কুচরিত্রের স্ত্রীলোক তার প্রণয়ীকে সম্বোধন করে' বল্‌ছে যে—"বলিতে-বলিতে অবনী থামিয়া পড়িল, কারণ ততক্ষণে জগৎবাবু দু'হাতে পেট চাপিয়া অট্টহাস্যের বিষম তোড়ে সোফার উপরে কাৎ হইয়া পড়িয়াছেন!

অবনী একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাস্‌ছেন কেন?"

কিন্তু জগৎবাবুর সে হাসি কি সহজে থামিতে চায়? অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, "রক্ষে পাই! এই বুঝি আপনার অশ্লীল গান?"

—"অশ্লীল বলে না-মান্‌লেও এটা সকলকেই মান্‌তে হবে যে, এ অতি কুরুচিপূর্ণ গান।"

—"আপনাদের কুরুচি-টুরুচি আমি অত বুঝি-টুঝি না মশাই! স্থানে অস্থানে অম্‌নি কুরুচির দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ত বলে হিন্দুরা আগে ব্রাহ্মদের যৎপরোনাস্তি ঠাট্টা কর্‌ত! এখন দেখছি কথাবার্ত্তায় কাগজে-বইএ হিন্দুরা অকারণে কুরুচি কুরুচি বলে এত-বেশী চ্যাচাচ্ছে যে, ব্রাহ্মরাও কখনো তত-জোরে চ্যাচাতে পারে-নি। আপনাকেও এই দলের ভেতরে দেখে আমি দুঃখিত হলুম অবনীবাবু!"

অবনী হতাশভাবে চেয়ারের উপরে হেলিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আপনার মত অতটা উদার হোতে পারলুম না জগৎবাবু! জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আপনারাও দেখছি রবি-ঠাকুরের গোঁড়া চ্যালা হয়ে পড়েছেন—নইলে এমন বিশ্রী গানটাও—"

জগৎবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "অনর্থক তর্কে কোন লাভ নেই। আপনার বোঝা উচিত, কবিতা বল্‌তে আহ্নিকের স্তব বোঝায় না। কবিরা হাল্‌কা রসকে 'বয়কট' কর্‌লে যৌবনের মুখ যে একেবারে বোবা হয়ে যাবে!"

অবনী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "জগৎবাবু, আমি যা বললুম তা সরল মনে সরল বিশ্বাসেই বলেছি। আপনার মেয়েকে এ-সব গান গাইতে শুন্‌লে সত্যিই আমি দুঃখিত হই!·····কারণ",—অবনী থামিয়া জগৎবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলিল, "কারণ,—আপনার মেয়েকে······আমি······ভালোবাসি!"

জগৎবাবু কিছু সন্দেহ না-করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মা ইন্দুকে সকলেই অম্‌নি ভালোবাসে!"

জগৎবাবু তাহার কথার আসল মানেটা বুঝিলেন না দেখিয়া অবনী নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে—

আপনার মনের কথা খুলিয়া না-বলিয়া আজ সে এখান হইতে কিছুতেই নড়িবে না! অতএব, ঘরের মেঝের দিকে তাকাইয়া আবার বলিল, "জগৎবাবু, আপনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না।"

—"কেন? আপনি ইন্দুকে ভালোবাসেন, এই বল্‌ছিলেন ত? এ আর এমন দুর্ব্বোধ্য কথা কি?"

মরিয়া হইয়া অবনী একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইন্দুলেখাকে আমি তাই বিবাহ কর্‌তে চাই।"

—"কি, কি বল্‌লেন?"

—"ইন্দুলেখাকে আমি বিবাহ কর্‌তে চাই।"

কিন্তু জগৎবাবু তখনো যেন নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একান্ত সন্দেহের সহিত তিনি অবনীর প্রায়-নাভি-চুম্বনোদ্যত দাড়ির দিকে অবাকভাবে চাহিয়া রহিলেন—ঐ কঠোর দাড়ির মধ্য হইতে বিবাহের মত কোমল কথাটা যে বাহির হইতে পারে, এ-যেন তাঁহার ধারণাতীত!

জগৎবাবুর চাহনির ভাব দেখিয়া অবনী আরো কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘাড় হেঁট করিয়া সে বলিল, "দেখুন, আপনার মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে চাই বলে আমি অনেক বড় সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি মুখ্যু বা গরীব নই---আমার হাতে পড়লে আপনার মেয়ে বোধ করি, অপাত্রে পড়বে না!"

এতক্ষণে জগৎবাবুর বিশ্বাস হইল, অবনী ঠাট্টা করিতেছে না—সত্য-সত্যই সে ইন্দুলেখাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক! কিন্তু অবনী এমন আচম্বিতে কথাটা তুলিয়াছে যে তিনি প্রথমত তাহার কিছু জবাব খুঁজিয়াই পাইলেন না। মেয়ের বিয়ে ত আর মুখের কথা নয়, যে আলৃটপ্‌কা ফস্‌-করিয়া হাঁ বলিয়া ফেলিলেই হইল। অতএব, মাথার

চুলের ভিতরে আঙুল চালাইতে-চালাইতে কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ থাকার প
জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু, এত-শীঘ্র আমি আপনার কথার জবা
দিতে পারলুম না—আমাকে দু'-চারদিন ভাববার সময় দিন।"

—"বেশ—তাহ'লে আজ আমি আসি" বলিয়া অবনী উঠিয়া ঘর
হইতে বাহির হইয়া গেল।

আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে জগৎবাবু হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আপনা-আপনিই বলিলেন, "অবনীকে দেখ্‌লে, কি তার কথা শুন্‌লে কারুর বোঝবার সাধ্যি নেই যে, তার মনটা মরুভূমির মত নয়! আজ দেখ্‌ছি সেখানেও সবুজের আঁচ্‌ আছে, আর সেখানেও ফুল ফুট্‌তে চায়! তাইত, অবাক কর্‌লে দেখছি!"

পাঁচ

ফোয়ারার পাশে একলাটি দাঁড়াইয়া ইন্দুলেখা লাল-মাছের খেলা দেখিতেছিল। পিছন হইতে জয়ন্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ইন্দু, তুমি কি চব্বিশঘণ্টাই বাগানে বসে-বসে কাটাবে? চল, আজ তোমাকে সেই নতুন গানটা শিখিয়ে দিই-গে!"

ইন্দু বলিল, "কোন্ গানটা?"

—"রবিবাবুর সেই 'দখিন হাওয়া'র গান!"

ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া ভুরু কপালে তুলিয়া বলিল, "ওরে বাস্‌রে, রবিবাবুর গান? উঁহু, অসম্ভব!"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আবার এ কি দুষ্টুমি!"

ইন্দু বলিল, "দুষ্টুমি নয় জয়ন্তবাবু, দুষ্টুমি নয়! হুকুম হয়েছে রবিবাবুর গান-টান আমি আর গাইতে কি শিখ্‌তে পারব না! আপনার রবিবাবু এবার গেলেন!"

"হুকুম! এমন হুকুম দিলেন কে? তোমার বাবা?"

—"উঁহু!"

—"তবে?"

—"অবনীবাবু।"

—"অবনীবাবু? কেন শুনি?"

—"রবিবাবুর গান নাকি অশ্লীল।"

—"এ হুকুম মান্‌বে কে ?"

—"আমি।' নইলে তিনি নাকি আমায় বিয়ে কর্‌বেন না"—বলিয়াই দুষ্টু ইন্দু মুখে কাপড়-চাপা দিয়া হাসিতে-হাসিতে সাম্‌নের দিকে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, "তোমার হাসি থামিয়ে ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি ?"

ইন্দু হাসির তোড় থামাইয়া কহিল, "বল্‌লুম ত, অবনীবাবু আমাকে বিয়ে করতে চান। বাবার কাছে তিনি নিজেই নিজের জন্যে ঘটকালি করে গেছেন।"—সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

জয়ন্তের মুখ মলিন হইয়া গেল। আস্তে-আস্তে বলিল, "তার জন্যে অত হাস্‌ছ কেন ?"

—"অবনীবাবুর কথা মনে হচ্ছে আর আমার হাসি আস্‌চে! কি করি বলুন দেখি জয়ন্তবাবু, লোকে আমায় ভারি বেহায়া ভাববে,—না ?"—তারপরেই ফের হাসি!

জয়ন্ত কোন জবাব দিল না, বসিয়া-বসিয়া আনমনে ভাবিতে লাগিল।

আকাশের মেঘপুরীর তোরণে তখন চাঁদের মশাল ধীরে-ধীরে উস্কাইয়া উঠিতেছে; নূতন ফাগুনের ঝির্‌ঝিরে বাতাস বাগানের থর্‌থরে ফুলে-ফুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে; এবং আমগাছের কোন্‌ ডালে একটা বন্দী-কোকিল সে বাতাসে সুদূর বনের বার্ত্তা পাইয়া উদাসপ্রাণে বারংবার ডাকিতেছে কুহু, কুহু, কুহু!

জয়ন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুর হাসি তখন থামিয়াছে—চাঁদের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ-করিয়া বসিয়া আছে।

জয়ন্ত গাঢ়স্বরে ডাকিল, "ইন্দু!"

—"উঁ!"

—"তুমি যা বল্‌লে তা সত্যি ?"

—"অবনীবাবুর দাড়ির দোহাই ! আমার একটি কথাও বানানো নয় !"

—"তোমার বাবার মত্ কি ?"

—"কে জানে !"

—"তুমি কি বল ?"

—"কিছু নাঃ !"

—"অবনীবাবুকে তুমি কি—"

—"উঁহু ! বিয়ে করে' কি হবে ?"

—"না, ঠাট্টা নয় ইন্দু ! আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

জয়ন্তের স্বর শুনিয়া ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। বলিল, "কি কথা জয়ন্তবাবু ?"

একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জয়ন্ত বলিল, "এই—তোমার—তোমার বিয়ের কথা !"

—"ও ছাই কথা থাক, আমার আদোপেই ভালো লাগ্‌চে না !"

জয়ন্ত ইন্দুর একখানা হাত আপনার মুঠোর ভিতরে চাপিয়া বলিল, "অনেক সময় অনেক কথা ভালো না-লাগ্‌লেও শুনতে হয়।"

জয়ন্তের হাতে হাত রাখিয়া ইন্দুর মনে হইল, জয়ন্তের হাতের আঙুলগুলি যেন কথা কহিতেছে ! সে কি কথা—কি কথা ? ইন্দুর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ইন্দুর আধফোটা কোরকের মত নত-নয়নের দিকে তরল চোখে চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল, তাহার মুখে আর সেই চপল হাসি নাই, সে এখন অত্যন্ত গম্ভীর।

জয়ন্ত মৃদু-স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি যদি আশা দাও আমি তাহ'লে তোমার বাবার কাছে যেতে পারি।"

ইন্দুর ঠোঁটদু'খানি কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। এক গা ঘামিয়া আড়ষ্ট হইয়া সে বসিয়া রহিল; এবং কি-এক ব্যথাভরা সুরে তাহার ছোট প্রাণখানি একেবারে ভরিয়া উঠিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "ইন্দু, তোমার মন জানি না, কিন্তু আমার মন সুধু তোমাকে চায়—সুধু তোমাকেই! আমার চোখের সাম্‌নে আর কেউ যদি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায়, তোমাকে হারিয়ে আমি তাহ'লে কি-করে বেঁচে থাক্‌ব?"

জয়ন্ত আশা-নিরাশায় দুলিতে-দুলিতে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল—সে দৃষ্টির সুমুখে লজ্জায় ভাঙিয়া পড়িয়া ইন্দু ঘাড় ফিরাইয়া আপনার বাহুমূলে মুখ লুকাইল। একটা দম্‌কা বাতাসে ইন্দুর ফুলগন্ধী চুলের রাশি উড়িয়া জয়ন্তের মুখে-চোখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইন্দুর হাত আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া জয়ন্ত কহিল, "বল, তোমার বাবার কাছে আমি এ-কথা তুল্‌ব কি না? যদি তোমার মত্‌ না-পাই তাহ'লে আজকের এই দেখা তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা!"

দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া খুব অস্পষ্ট স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু!"

—"বল, তুমি আমাকে বিবাহ করবে?"

জবাব দিতে ইন্দুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। তবু সে প্রাণপণে বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ!"

হ্যাঁ!—এই সামান্য একটি কথায় জয়ন্তের সমস্ত মন যেন বিশ্বের নিখিল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! আনন্দের আবেগে অধীর হইয়া

সে ইন্দুর শীতল ও নরম করপুটের উপরে আপনার তপ্ত-ওষ্ঠাধর রাখিয়া একটি চুম্বন দান করিল!

গগনের জ্যোৎস্না-সায়রে কালো মেঘের ভাঙন-ধরা-কূলে চাঁদ তখন ঠেকিয়া আছে—সে-যেন স্বর্গ-রূপসীর নিজের হাতে ভাসিয়ে-দেওয়া আশার প্রদীপ! চারিদিকে স্তব্ধতার ঘুম ভাঙাইয়া, ইন্দুর বাগানে তখন কোকিল ও পাপিয়া এ-উহাকে হারাইবার জন্য অবিশ্রান্ত গানের ঝঙ্কার তুলিয়াছে!

ছয়

সেদিন জগৎবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার আসর কিছুতেই জমিতে চাহিতেছিল না—কাজেই সকলে বাধ্য হইয়া স্বর্ণেন্দুর মুখে তাহার 'মেজমামা'র চিরন্তন কাহিনী একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে শুনিতেছিলেন।

স্বর্ণেন্দু মাঝে-মাঝে সিগারেটে এক-একটা জোর-টান মারিতেছে এবং সেইসঙ্গে মহা উৎসাহের সহিত বলিতেছে, "বুঝলেন কিনা কৈলেসবাবু, মেজমামার চা-খাওয়া, সে এক অবাক কারখানা! পাক্কা গোয়ালঘরে তিন-তিনটে হাতীর মত নাদুস্-নুদুস্ ভাগলপুরী গাই বাঁধা আছে। আমি বল্লুম 'হ্যাঁ মেজমামা, এ গরুগুলো আলাদা ঘরে বাঁধা কেন?' মেজমামা একটুখানি মুচ্কে হেসে বল্লেন, 'জানিস্ না বুঝি? এ যে চায়ের গরু!'—সে গরু-তিনটে যত দুধ দেয়, সব ক্ষীর করে' চায়ে ঢালা হয়। আহা, মেজমামার বাড়ীর চা—সে ত চা নয়—বুঝলেন কি না—সে হচ্ছে সুধা, সুধা!"—বলিয়া পাইপ হইতে দগ্ধীভূত সিগারেটের অবশিষ্টটা ফেলিয়া দিয়া সে আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

জয়ন্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি সিগারেটে ফাঁশীর টান দিচ্ছেন যে! বিনামূল্যে সিগারেট পেয়েছেন বলে এতটা desperate হয়ে উঠ্বেন না!"

লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণেন্দু সিগারেট নামাইয়া জয়ন্তের দিকে [illegible]কাচ করিয়া চাহিল।

এমন সময় ঘরের ভিতরে আর-একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল; সকলেরই কাছে তাহার মুখ চেনা-চেনা বোধ হইল, অথচ কেহই ঠিক চিনিতে পারিলেন না!

জগৎবাবু দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে খুঁজ্‌চেন ?"

—"একি, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না !"

তাহার গলার স্বরে চম্‌কাইয়া, সকলেই একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অবনীবাবু !"

কৈলাসবাবু হাঁচিবার জন্য স্তিমিত চক্ষে মস্ত-একটা হাঁ করিয়াছিলেন —কিন্তু দাড়িকামানো অবনীকে দেখিয়া তাঁহার হাঁচি আট্‌কাইয়া গেল —তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! আপনার বিখ্যাত দাড়ি-গোঁফ কার জিম্মায় রেখে এলেন ?"

চিবুকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে অবনী অতিশয় করুণ স্বরে বলিল, "কামিয়ে ফেলেছি !"

—"বলেন কি ! আপনার দাড়ি দেখ্‌লে সন্দেহ হোত, দাড়ি আগে না আপনি আগে জন্মেছেন—তেমন বর্দ্ধিষ্ণু দাড়িটিকে আপনি কোন্ প্রাণে নির্ব্বাসিত কর্‌লেন ?"

অবনী ফোঁশ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা যেতে দিন !"

শত শত হাসি-ঠাট্টার চোখা চোখা বাণ যে দুর্ভেদ্য দাড়ির একগাছি চুলও খসাইতে পারে নাই, কত দুঃখে এবং গূঢ় কারণে অবনী যে তাহার সেই সনাতন শ্মশ্রুগুম্ফের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, এ-ঘরের এতগুলি লোকের মধ্যে কেবল জগৎবাবু ও জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ তাহা টের পাইলেন না।

* * * *

সেদিনকার মত আসর যখন ভাঙিয়া গেল, জগৎবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, বোসো, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসুভাবে জগৎবাবুর দিকে চাহিল।

জগৎবাবু একবার দরজার দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন সকলে চলিয়া গিয়াছে কিনা! তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু হঠাৎ কেন দাড়ি কামালেন জান?"

জয়ন্ত মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিল, "জানি।"

জগৎবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "জান? আচ্ছা, কেন, বল দেখি?"

—"অবনীবাবু বিয়ে করতে চান।"

—"কি করে' জানলে তুমি?"

—"ইন্দুলেখার মুখে শুনলুম।"

—"আমার হাবা মেয়ে বুঝি তোমার কাছে কোন কথাই লুকোয় না......যাক্, ইন্দুর বিবাহ নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

—"কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।"

—"বল!"

জয়ন্ত মাথা নামাইয়া বলিল, "জগৎবাবু, জানবেন আপনার মতামতের ওপরে আমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

জগৎবাবু খরচোখে জয়ন্তের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,—"তাইত হে, তোমার মুখখানা হঠাৎ যে রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে তাতে বোধ হচ্ছে তোমার নিবেদনটা কিছু গুরুতর। কিন্তু জয়ন্ত, তুমি ত জানই, গম্ভীর মুখ আমি দু'-চক্ষে দেখতে পারি না—আমার কাছে সহজভাবেই নিবেদন জানালে আমি খুসি হব।"

—"আজ্ঞে, আমি ইন্দুলেখার বিবাহের কথাই বলতে চাই।"

—"ইন্দুলেখার বিবাহের কথা বল্‌তে চাও ত মুখের ওপরে অতবড় গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়েছ কেন ?"

জয়ন্ত লজ্জিত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, একটু কারণ আছে।"

—"আবার, কারণ! যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে, অকারণে আপনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—পদে পদে কারণ খোঁজে, বার্দ্ধক্য! কিন্তু তোমরা—একালের যুবকরা, এম্‌নি বুড়ো হয়ে পড়েছ যে, অকারণে কিছুই কর্‌তে জান না! তোমরা কাব্য লিখ্‌বে—বিবাহের প্রীতি-উপহারের জন্যে; উপন্যাস লিখ্‌বে—সমাজ বা ধর্ম্মতত্ত্ব বা কৃষিকার্য্য শেখাবার জন্যে; লেখাপড়া শিখ্‌বে—চাকরি কর্‌বার জন্যে! কেন রে বাপু, এত কারণ দ্যাখ্‌বার দরকার কি ?"

জয়ন্ত মাথা তুলিয়া বলিল, "থাক্ জগৎবাবু, আজ্‌কে আমার নিবেদনটা চাপাই থাক্, আর-একদিন শুন্‌বেন তখন!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এই ত বাপু, যৌবনের ধর্ম্ম আপনি ফুটে উঠল! কারণ দেখিয়ে নিবেদন জানাতে এসেছিলে, এখন অকারণে রাগ কর্‌লে চল্‌বে না ত!"

—"আজ্ঞে, আমি রাগ করি-নি ত!"

—"রাগ কর-নি কি-রকম ? খুব বেশী-রকমই রাগ করেছ! নইলে, যে কথার ওপরে তোমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর কর্‌ছে—সে কথাটা না-বলেই মুখবন্ধ কর্‌তে চাও ?"

জয়ন্ত অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিল।

জগৎবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর কোমল স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ জয়ন্ত, ইন্দুকে আমাদের অবনীবাবু বিবাহ কর্‌তে চান—তাই ভেবেছিলুম, তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে কিছু পরামর্শ করব। কিন্তু এখন দেখছি তোমার সঙ্গে পরামর্শ নিষ্ফল।"

—"বলুন না, নিষ্ফল কেন হবে জগৎবাবু ?"

—"নিষ্ফল হবে না ? যে বিচারক, সে আসামী হোলে মকদ্দমা চল্‌বে কেন হে ?"

—"আপনি কি বল্‌ছেন !"

জগৎবাবু জয়ন্তের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর জয়ন্তের একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাপু হে, বুড়োদের তোমরা যতটা 'ফ্যুল' ভাব, আসলে আমরা ঠিক ততটা হাঁদা নই ! তুমি কি ভাব্‌ছ তোমার মুখ দেখে আর তোমার 'নিবেদনে'র ভূমিকা শুনে আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারি-নি ?"

জয়ন্ত হেঁটমুখে একেবারে চুপ !

জগৎবাবু তেম্‌নি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "পাত্র-হিসেবে অবনী যে খারাপ, তা নয় ! কিন্তু তোমাকে আমি বেশী পছন্দ করি—আর মা-ইন্দুও বোধ করি তোমাকে আমার চেয়েও বেশী পছন্দ করে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক !"

জয়ন্তের মনের আনন্দ তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু বোধ হয় চটে যাবেন ! কিন্তু কি কর্‌ব, ইন্দু আমার বড়-আদরের মেয়ে, তার সুখ-অসুখে দৃক্‌পাত না-করে আমি ত আর অবনীবাবুকে খুসি রাখ্‌তে পারব না !"

সাত

শিল্পীর বাটালির ছোঁয়া পাইবার আগে মূর্ত্তি-গড়িবার পাথর যেমন আকারহীন ও কুদর্শন হইয়া থাকে, প্রেমের পরশ না-পাইলে মানুষের জীবনও তেম্‌নি একটা সুডৌল-সুশ্রী আকার লাভ করিতে পারে না। তাই জয়ন্তের সেদিন মনে হইল, এতদিন পরে যথার্থ প্রেমের সাক্ষাৎ পাইয়া আজ তাহার শূন্যজীবন পূর্ণ, সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে!

আপনমনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়িতে-গায়িতে জয়ন্ত যখন বাসায় ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল, ভজহরি লণ্ঠনের আলোয় তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "ইস্, খোকন যে আজ বড্ড খুসি!"

ভজহরি তাহাদের পুরণো চাকর। জয়ন্তের স্বর্গীয় মাতার বিবাহের সময়ে তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে সেই যে সে সঙ্গে আসিয়াছিল, আর আজ-পর্য্যন্ত একবারও ছুটির নাম মুখে আনে নাই! তাহার কোলপিঠই ছিল জয়ন্তের শিশুকালের খেলাঘর এবং আজ এই পূর্ণযৌবনেও ভজহরির মমতাভরা বুক, স্নেহভরা কোল এবং সেবাভরা বাহুর বাঁধন পাইয়া জয়ন্ত নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া আছে।

পুরাতন বটবৃক্ষের মত এই পুরাতন চাকরটিরও বয়স যে কত, কেউ তা জানে না। কিন্তু এত বয়সেও ভজহরি বেশ শক্তসমর্থ আছে এমন-কি, জয়ন্ত এখনো যেদিন গান গায়িতে বসিয়া বাড়া ভাত ঠাণ্ডা করিয়া ফেলে, ভজহরি ক্রোধভরে আসিয়া তাহাকে শিশুর মত অনায়াসে কোলে তুলিয়া খাবারের সাম্‌নে লইয়া গিয়া বসাইয়া দেয়।

জয়ন্ত যদি হাসিয়া বলে—"হ্যারে ভজা, তোর ঐ বুড়ো হাড়ের জোর কি কি কোনদিনই কম্‌বে না রে ?"

ভজহরি ফোলা-ফোলা দড়ির মত শিরাভরা হাতদু'খানা নাড়িয়া উত্তর দেয়, "এ বুড়ো হাড় নয় রে খোকন, এ বুড়ো হাড় নয়—এ হচ্চে পাকা হাড় ! বাঁশের লাটির মত আমার হাড় যত পুরণো হচ্চে, তত পেকে উঠ্‌চে—এর জোর কি কখনো কমে রে বোকা ?"

—"তুই কি বল্‌তে চাস্‌ তোর জোর কখনো কম্‌বে না ?"

—"কম্‌বার যো কি ? আমার জোর কম্‌লে তোকে দেক্‌বে কে রে খোকন ? আর এটাও ঠিক জানিস্‌ যে, আমার খোকনকে বুকে কর্‌বার জোর যেদিন যাবে, তোর ভজা সেদিন পটল তুল্‌বেই তুল্‌বে !"

পুরণো চাকর একটু গায়ে-পড়া হয় ; মনিবকে সে ভালোবাসে কিন্তু মনিবের ধম্‌কানি গ্রাহ্য করে না। ভজহরিও সেই স্বভাবের লোক ; জয়ন্তের সঙ্গে সে সমান ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিত, দরকার হইলে উপদেশ-পরামর্শ বা ধমক-ধামকটাও দিতে ছাড়িত না।

জয়ন্ত সেদিন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যখন গায়ের জামাটা খুলিতেছে, ভজহরি তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "দেশ থেকে তোমার চিটি এসেচে—নাও।"

জয়ন্ত চিঠিখানা খুলিল। ভজহরি মাটির উপরে উবু হইয়া বসিয়া কৌতূহলের সহিত ঘাড় তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চিঠি লিখিয়াছেন অন্নপূর্ণা। জয়ন্ত পড়িতে লাগিল :—

"বাবা জয়,

আজ একসপ্তাহ তোমার কোন খবর না-পেয়ে ভাবিত আছি, শীঘ্র তোমার কুশল-সংবাদ দেবে।

এদিকে গৌরীকে আর রাখা যায় না ; তুমি এখন বিয়ে কর্‌বে না

বলে খালাস হ'লে ত চলবে না। পুরুষমানুষ বেশী বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাকলেও চলে—পুরুষের সব শোভা পায়; কিন্তু স্ত্রীলোক তা করলে নানাজনে নানাকথা কয়—বিশেষ পল্লীগ্রামে। কাজেই আমি, ঠিক করেছি, আসছে বৈশাখ মাসেই একটা ভালো দিন দেখে তোমার বিবাহ দেব। এতে তোমার অমত হ'লে চলবে না। আমরা সবাই ভালো আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মা।"

চিঠি পড়িয়া জয়ন্তের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

ভজহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "ও কি খোকন, তোর মুখ অমন হোলো ক্যানো? বাড়ীর খপর কি ভালো নয়? মা-ঠাকরোণ ক্যামন আচেন? গৌরী—"

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বলিল, "তারা সবাই ভালো আছে। তুই এখন যা ভজা, কাণের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে' আমাকে আর জ্বালাতন করিস্-নে!"

কিন্তু ভজহরি সেখান হইতে এক আঙুলও নড়িল না—ভাবিল নিশ্চয় কোন খারাপ খবর আসিয়াছে, খোকন তাহার কাছে লুকাই-তেছে। চিঠিখানা জয়ন্তের হাত হইতে ফস্-করিয়া টানিয়া লইয়া, আলোর কাছে ধরিয়া সন্দিগ্ধ চোখে সে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বারংবার দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই আঁকাবাঁকা কালির দাগের ভিতর হইতে ভালো-মন্দ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না। শেষটা হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিরক্ষর ভজহরি সকাতরে বলিল, "তোর পায়ে পড়ি খোকন, আমার কাচে কিছু লুকোস-নে!"

—"তবে তোর মুখ অমন শুকিয়ে গ্যাল ক্যানো ?"

—"শুকিয়ে গেল, সে আমার ইচ্ছে! তোর সব কথায় দরকার কি ?"

—"বল্ না খোকন, লক্ষ্মীটি! বুড়োকে ক্যানো খাম্‌কা কষ্ট দিচ্চিস্!"

—"মা লিখেছেন বশেখ মাসে গৌরীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

ভজহরি বেজায় খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "সত্যি ? এর জন্যে আবার ভাব্‌না ক্যান্‌রে হাঁদা!"

জয়ন্ত নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি আপনমনে বড়্-বড়্ করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "বশেখ মাসে নয় ? এটা হোলো গিয়ে মাঘমাসের সাতাস তারিখ্—না খোকন ? হুঁ, হাতে রইল ফাগুন চোত্—কুল্যে এই দু'টো মাস। তাহ'লে একুনি থেকে সব উয্যুক-আয়োজন কর্‌তে হয় যে! আমার খোকনের বিয়ে—একি একটা যা-হোক্-তা-হোক্ ব্যাপার! সাতদিন ধরে সাত গাঁয়ে পাত্ পড়বে না, ঢাকের বাদ্দি শুনে-শুনে একমাস লোকের কাণে তালা লেগে থাক্‌বে, আর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "থাম্ ভজা, থাম্! বিয়ে কর্‌ছে কে ?"

ভজহরি বলিতে-বলিতে থামিয়া পড়িয়া, বিস্ময়ে দুইচক্ষু ড্যাব্‌রা করিয়া জয়ন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বলিল, "ভজা, মা যতই বলুন এ বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌ব না!"

—"খোকন, এ কি বলিস্ রে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ক্যানো ?"

—"আমাদের সাম্‌নের বাড়ীর ঐ জগৎবাবুকে জানিস্ ত ? আমি তারই মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব।"

"অ্যাঃ! কে এ সমন্দ কর্‌লে ?"

—"আমি!"

—"মা-ঠাক্‌রোণ জানেন ত ?"

—"না। কিন্তু আজই তাঁকে চিঠি লিখে সব জানাব।"

ভজহরির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "খোকন, মাকে তুমি জান ত! কেউ তাঁর অমতে কাজ কর্‌লে তাঁর মন নোয়ার মত শক্ত হয়ে ওটে। অ্যামন কাজ করিস্-নে—করিস্-নে!"

—"উপায় নেই।"

ভজহরি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু খোকন, গৌরীদিদির প্রাঁতে তুই কতবড় ঘা মার্‌বি তা কি একবার ভেবে দেকেচিস্? সে যে তোকে একন থেকেই স্বোয়ামীর মত ভক্তি করে, ভালোবাসে!"

ঠিক এইখানেই জয়ন্তের মনেও কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। গৌরীকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে ? তাহার কোমল প্রাণের ভিতরে, শৈশব হইতে এই উন্মুখ যৌবন পর্য্যন্ত যে ভাবের ধারা অবাধে বহিয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ সে ধারাকে সে বন্ধ করিয়া দিবে কিরূপে ? এ কি নির্দ্দয়তা নয় ?

জয়ন্ত বিবর্ণ মুখে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দক্ষিণের জান্‌লা খোলা ছিল ; সেই পথে নব-বসন্তের মধুর বাতাস একটা রাগিণীর সুর বহিয়া আনিয়া জয়ন্তের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিল—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
তুমি অবসর-মত বাসিও—"

এ ইন্দুলেখার গান !

জয়ন্ত সমস্ত ভাবনা ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল—তাহার মনে হইল, এ গান যেন তাহাকেই শুনাইয়া-শুনাইয়া গাওয়া হইতেছে !……

সে গানের সুরের ভিতরে পড়িয়া অভাগী গৌরীর কাতর মুখ, জোয়ারের স্রোতে ছেঁড়া ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গেল !

আট

বৈকালে ঠাকুরঘরে বসিয়া অন্নপূর্ণা আরতির উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছেন। দরজার কাছে গৌরী, কোলের উপরে একখানা কুলা লইয়া ধান বাছিতেছিল।

এমন সময় দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা কোশার ভিতরে গঙ্গাজল ঢালিতে-ঢালিতে বলিলেন, "কার চিঠি রে?"

দাসী বলিল, "সরকার-বাবু বল্‌লেন কল্‌কাতার চিটি।"

গৌরী বুঝিল, কার চিঠি! একবার লজ্জিত চোখে পত্রের দিকে চাহিয়াই, আবার মুখ নামাইয়া সে ধান বাছিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা ঐখানে রাখ্, দেব্‌তার কাজ না-সেরে ও ত আর ছুঁতে পার্‌ব না!"

ঠাকুরঘরের কাজকর্ম্ম চুকাইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা এইবার দে ত গৌরী!"

গৌরী চিঠিখানা অন্নপূর্ণার হাতে দিয়া আবার ধান বাছিতে লাগিল —কিন্তু তাহার কাণ রহিল সজাগ।

অন্নপূর্ণা খাম ছিঁড়িয়া জয়ন্তের চিঠি পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু পড়িতে-পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব ধীরে-ধীরে বদ্‌লাইয়া গেল। পড়া যখন সাঙ্গ হইল—তখন তাঁহার মুখ একেবারে শাদা!......স্তম্ভিতের

মত অন্নপূর্ণা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, পত্রখানা তাঁহার অসাড় হাত হইতে খসিয়া মাটির উপরে পড়িয়া গেল।

দেখিতে-দেখিতে অন্নপূর্ণার মুখ রাগে একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল, বিকৃত রুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "জয় কি এতবড় পাষণ্ড হয়েছে!"

সে স্বরে চমকিয়া গৌরী মাথা তুলিল। অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল!

জান্‌লা দিয়া আচম্‌কা একটা বাতাস আসিয়া গৃহতল হইতে জয়ন্তের পত্রখানা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, গৌরী তাড়াতাড়ি সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া দু'-হাতে সেখানা চাপিয়া ধরিল।

হঠাৎ চিঠির এক জায়গায় তাহার চোখ পড়িয়া গেল। সেখানে লেখা রহিয়াছে, "মা, গৌরী বোনের মত আমার কাছে থাক্—তাকে আমি চিরকাল স্নেহের চোখে দেখ্‌ব, কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ এই যে,—" গৌরী আর পড়িতে পারিল না, জয়ন্তের হাতের সেই নিষ্ঠুর অক্ষরগুলো যেন আগুনে-পোড়ানো সূঁচের মত তাহার চোখে বিঁধিয়া তাহাকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিল।

অন্নপূর্ণা কঠিন স্বরে বলিলেন, "গৌরী, তুই এখন এখান থেকে যা!"

গৌরী আস্তে আস্তে উঠিয়া আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু তখন বিস্ফারিত, নাসারন্ধ্র থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, ওষ্ঠাধর পরস্পরের উপরে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা বিদ্যুতের আঁখরে তাঁহার চোখের সাম্‌নে জ্বলিয়া উঠিল,—গৌরীর মা, মেনকার হাত ধরিয়া গঙ্গাজল ছুঁইয়া তাঁহার সেই শপথ!······তারপর, সেইদিন! যেদিন মেনকার মৃত্যু-

শয্যায় তিনি শিশু গৌরীকে আপনার ভাবী-পুত্রবধূ বলিয়া কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন এবং তাই দেখিয়া মরণকালেও মেনকার মুখে নিশ্চিন্ত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জয়ন্তের জন্য আজ কি তাঁহার সত্য ভঙ্গ হইবে?......অন্নপূর্ণার বুকটা ধুক্‌ধুক্‌ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, পরলোকে মেনকার অশরীরি আত্মা এতক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

জয়ন্ত যে তাঁহাকে এতবড় দাগা দিতে চাহিবে, এ তিনি কখনো ভাবেন নাই। চিঠিতে সে আর-একজনের কথা লিখিয়াছে, কে সে? কার মেয়ে—হিন্দু না ক্রীশ্চান? কি কুহকে সে তাঁহার একান্ত-অনুগত জয়ন্তকে এমন বশ করিয়াছে যে, সে আজ ন্যায়-অন্যায় বিচার পর্য্যন্ত করিতেছে না?

আর গৌরী? অন্নপূর্ণা জানিতেন, জয়ন্তকে এখন থেকেই সে স্বামী বলিয়া জানে! জয়ন্তকে সে ভালোবাসে! এখন জয়ন্ত যদি তাকে ত্যাগ করে, তবে তাহার দশা কি হইবে, সে কোথায় দাঁড়াইবে?

অন্নপূর্ণা আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এমন পাপ আমি হোতে দেব না—জয়ন্ত কি ভেবেছে নারী বলে আমি সুধু আদর কর্‌তেই জানি,—শাসন কর্‌তে জানি না!"

দরজার কাছ হইতে শোনা গেল, "পা-ধোবার জল দাও গো,—একি, ঠাকুরঘরে এখনো সন্ধ্যে দেওয়া হয়-নি!"

এ পুরুতঠাকুরের গলা! অন্নপূর্ণার তখন হুঁস্ হইল,—চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভর্‌সন্ধ্যার পাত্‌লা অন্ধকারে চারিদিক আব্‌ছায়া হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "গৌরী, ও গৌরী—শুন্‌ছিস্, সাড়া দিচ্ছিস্ না যে, কাণের মাথা খেয়েছিস্ নাকি?"

পাশের ঘর হইতে গৌরীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—"যাই মা, যাই!"

অন্নপূর্ণা পুরুতঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, গৌরী আসিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ মা?"

—"কি বল্‌ছি? আ হাবা মেয়ে, সন্ধ্যে যে উৎরে গেছে, আজ কি আর শাঁক-টাক্‌ বাজাতে হবে না?"—বলিতে-বলিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা অবাক্‌ হইয়া গেলেন।

গৌরীর চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা—সে যেন এইমাত্র কাঁদিতে-কাঁদিতে কান্না থামাইয়া উঠিয়া আসিয়াছে!

নয়

ইন্দুলেখার ময়নাটা এম্নি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আজকাল যাকে-তাকে সে "দূর পোড়ারমুখো" বলিয়া গালাগালি দিতে সুরু করিয়াছে !

অতএব ইন্দু সেদিন চীনের বাদাম খাইতে-খাইতে তাকে বুঝাইতেছিল, "ছি ময়না, অমন করে কি গালাগাল দিতে আছে ?"

ময়না তার চোখ পাকাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখো !"

ইন্দু চটিয়া বলিল, "আ গ্যালো যা, আমার খেয়ে আমাকেই গালাগাল ? রও, আজ তোমাকে ছাতু খেতে দিচ্ছি না—দু-বেলা পেটভরে খেয়ে-খেয়ে তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না ?"

জয়ন্ত পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, "খেতে পেয়েও ময়না যখন তোমাকে গালাগাল দিচ্ছে, তখন খেতে না পেলে ও তোমাকে আরো বেশী গালাগাল দেবে, ইন্দু !"

জয়ন্তের কথায় যেন সায় দিয়াই ময়না আবার চ্যাচাইয়া উঠিল, "দূর পোড়ারমুখো !"

ইন্দু চোখ রাঙাইয়া শাসাইয়া বলিল, "ময়না, ফের্ !"

কিন্তু ময়না তাতে একটুও দমিয়া গেল না ; ডান পা দিয়া ঠোঁট্টা চট্পট্ সাফ্ করিয়া লইয়া ইন্দুকে উল্টা ধমক দিতে লাগিল, "কোঁ-কট্কট্ কোঁ-কট্কট্, কোঁ-কট্কট্ !"

—"ও কি বল্‌তে চায় জয়ন্তবাবু ?"

—"এবারে ও তোমাকে নিজের ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে—কেরাণীরা

সায়েবের সুমুখেই সায়েবকে গালাগাল দিতে হ'লে এই চরম উপায়ই অবলম্বন করে! ওটা হচ্ছে দাসত্বের লক্ষণ!"

ইন্দুলেখা বাদামের খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে বাগানের একদিকে চাহিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার চাকর বোধ হয় আপনাকে ডাকতে আস্‌ছে,—ঐ দেখুন!"

জয়ন্ত ফিরিয়া দেখিল, ভজহরি চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে তাহাদেরি দিকে আসিতেছে! সে ডাকিয়া বলিল, "কি রে ভজা, তুই যে বড় হঠাৎ এখানে?"

ভজহরি পাণের ছোপ্‌ধরা দু-পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার বৌ দেকতে এলুম খোকন।"

ইন্দুলেখা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

জয়ন্ত বলিল, "এ আমাদের পুরণো লোক, এর হাতেই আমি মানুষ হয়েছি ইন্দু!"

একটা চীনেম্ বাদাম টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া ইন্দু বলিল, "ও!"

ইন্দুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভজহরি বলিল, "হ্যাঁ, খোকন, এই মেয়েটির সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে বুঝি?"

জয়ন্ত বিরক্তভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

এত-বড় মেয়ে, এখনো আইবুড়ো! বৌয়ের বয়স বেশী দেখিয়া ভজহরি মনে মনে বড় খুসি হইল না। কিন্তু মুখে মনের কথা না ভাঙিয়াই বলিল; "বাঃ, খাসা মেয়ে ত!"

ইন্দু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভজহরি মনে মনে তুলনা করিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের গৌরীর চেয়ে এ মেয়েটির রং ঢের ফর্‌সা বটে, কিন্তু এ-যেন কিছু বেহায়া! গৌরী ত বরের সাম্‌নে এমন করে' কখনো চীনেম্ বাদাম খায় না!

গৌরীকে বৌ বলে যেমন মানায়, খোকনের পাশে একে ঠিক তেমনটি ত কে মানাচ্ছে না!

হঠাৎ ইন্দুলেখার পায়ের মখ্‌মলের চটি-জুতোর দিকে ভজহরির নজর পড়িল। বৌয়ের পায়ে জুতো—অ্যাঃ! তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল, যেসব মেয়ে জুতো পায়ে দেয় তারা সবাই ক্রীশ্চান!

ফস্ করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "হ্যাগা বাছা, তোমরা হিঁদু ত?"

ভজহরির বিস্মিত মুখ দেখিয়া এবং এই উদ্ভট প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দুলেখা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, আমাকে দেখ্‌লে কি মোছলমান বলে মনে হয়?"

ভজহরি থতমত খাইয়া বলিল, "না—না, বল্‌চি কি—ইয়ে—ইয়ে—"

ইন্দুলেখা বেচারাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "হ্যাগো হ্যাঁ, আমরা হিন্দু!"

—"তবে তুমি জুতো পরেচ ক্যানো গো বাছা?"

—"কেন, জুতো পর্‌লে কি আর হিন্দু হোতে নেই?"

ভজহরি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "আমি পাড়াগেঁয়ে মুক্যু-সুক্যু মানুষ মা, সহরের ধরণ-ধারণ ত জানি না, তা ক্ষেমা-ঘেন্না করে' কিছু মনে কোরো না।" এই বলিয়া সে আস্তে-আস্তে আবার বাড়ীমুখো হইল।

খোকনের বৌ রূপসী হইলেও, সে জুতো পরে এবং বরের সাম্‌নে বেহায়ার মত চীনের বাদাম খায় বলিয়া, বুড়ো ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। এর-চেয়ে গৌরী ভালো, বয়সেও ছোট, মুখটিতেও লজ্জা মাখানো—বৌ যেমনটি হয়, তেম্‌নি! গৌরীর নিরাশ মুখ ভাবিয়া ভজহরির ভারি দুঃখ হইল।

কিন্তু খোকনকে সে এত ভালোবাসে যে, গৌরীকে বিবাহ করিতে না-চাওয়ার দরুণ জয়ন্তের যে কিছু অন্যায় হইয়াছে, এটাও সে মনে করিতে পারিল না। 'আমরা বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমাদের পছন্দে-অপছন্দে কি এসে যায়? বৌ যখন খোকনের মনে ধরেচে তখন তার ওপর আর কথা নেই, সে যা ভালো বোঝে তাই করুক্!'

—এই ভাবিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনের সমস্ত ইতস্তত বাহির করিয়া দিয়া বৃদ্ধ ভজহরি নিশ্চিন্ত স্বরে গান ধরিল—

"হরি হে, কেমনে ভুলিব তোমায়!
ওহে বঙ্কুরায়, ভুলে রৈলে মথুরায়—
—কেমনে ভুলিব তোমায়!"

*　　*　　*　　*　　*

এদিকে, বৈকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া জগৎবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, অবনী।

খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আসুন।"

অবনী তাঁহার সামনেই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাগজ পড়্ছিলেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ পড়্তে পড়্তে ভাবছিলাম যে, এত-বড় পৃথিবীতে নতুন-কিছু ঘট্ছে না—সব খবরই পুরণো আর একঘেয়ে। ধরিত্রী দেখছি একেবারে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে—তার মধ্যে রস্-কস্ বৈচিত্র্য যা-কিছু ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নিংড়ে সমস্ত বার করে নিয়েছেন।"

অবনী ডিবা হইতে একটা পান লইয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "হ্যাঁ, ও কাগজ-টাগজ পড়া না-পড়া দুই-ই এখন এক কথা।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আমাকে পড়্‌তে হয়, নৈলে সময় কাটে না যে! সবের মধ্যে ভালো লাগে তবু পুলিস-কোর্টের কলমটা। বিংশ শতাব্দীর রোম্যান্‌স্‌ উপন্যাসের সীমানা আর মানুষের জীবন থেকে পলায়ন করে' আশ্রয় নিয়েছে ঐ পুলিসকোর্টের ভিতরে গিয়ে!"—বলিয়া, গলা চড়াইয়া হাঁকিলেন, "ওরে, তামাক দিয়ে যা!"

চাকর তামাক দিয়া গেল। নলটা হাতে করিয়া, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "বাজে কথা যাক্‌। এখনো কেউ আসে-নি, এইবেলা চুপি-চুপি আপনার সঙ্গে দু'টো কাজের কথা কয়ে-নি।"

অবনী বুঝিল, কি কথা! কাণ খাড়া করিয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

জগৎবাবু আগে আলবোলার নলে দু'-তিনটি টান মারিলেন; তারপর আস্তে-আস্তে বলিলেন, "অবনীবাবু, আপনি আমার মত্‌ জানেন ত, মেয়েদের আমি দাস-ব্যবসার পণ্য বলে ভাব্‌তে পারি না; সুতরাং যাকে খুসি তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেবার ক্ষমতা আমার নেই,—যদিও আমি পিতা।"

অবনী সায় দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই ত উচিত। একপক্ষ থেকে গ্রহণ কর্‌লেই ত চল্‌বে না, যার সঙ্গে আজীবন এক হয়ে থাক্‌তে হবে, সেই ভবিষ্য স্বামীকে কন্যাও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চায় কিনা, সেটা দেখাও যে খুব দরকার।"

জগৎবাবু বলিলেন, "কিন্তু অনেকে এ সহজ কথাটাও বোঝেন না, বা বুঝ্‌তে চান না। মন্ত্রশক্তিতে বোধহয় তাঁদের অসীম বিশ্বাস; তাঁরা তাই ভাবেন, পুরুত এসে টিকি নেড়ে বড়্‌ বড়্‌ করে' দু'টো মন্ত্র পড়ে দিলেই, সম্পূর্ণ অচেনা দু'টি মানুষ তাদের চরিত্রের সমস্ত পার্থক্য ভুলে

চিরকাল মিলে-মিশে এক হয়ে থাক্‌বে। তা যদি সম্ভব হোতো, খবরের কাগজে পুলিসকোর্টের রিপোর্টে তাহ'লে প্রায়-প্রত্যহই দাম্পত্যপ্রণয়-ভঙ্গের এত মোকদ্দমার কথা দেখ্‌তুম না। শাস্ত্র যতই কোলাহল করুক,—আমি কিন্তু জানি, মন্ত্র পড়্‌লেই বিবাহ হয় না ; সেই বিবাহই আসল বিবাহ—যে বিবাহে পাত্র আর পাত্রী দু'জনেই সচেতন ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করে।"

অবনী বলিল, "এ কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু, সেকালে যখন গৌরীদান-প্রথার চলন ছিল, তখন মেয়ের মত্‌ জানবার কোন দরকার হোতো না। কারণ, শৈশবে বিবাহ হোতো বলে কন্যার মনে তখন বিচার-শক্তি নামে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাক্‌ত না। কাঁচা বাঁশের মত মেয়ের শিশু মন তখন কোমল থাক্‌ত, কাজেই স্বামী তাকে অনায়াসেই নিজের চরিত্রের উপযোগী করে' গড়ে নিতে পার্‌ত। এখন কিন্তু সমাজের সে অবস্থা আর নেই। একালে নানা কারণে মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে বেশী বয়সে। সুতরাং বিবাহের আগেই তাদের চরিত্র পরিণত হয়ে গড়ে ওঠে ; সে-ক্ষেত্রে পিতার ইচ্ছায় কলের পুতুলের মত তারা যদি এমন পুরুষকে বিবাহ কর্‌তে বাধ্য হয়—যাদের চরিত্রের সঙ্গে তাদের চরিত্রের সবদিকেই গরমিল, তাহ'লে সে বিবাহের পরিণাম চরম অমঙ্গলে।"

জগৎবাবু তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলিলেন, "সুতরাং বিবাহের আগে মেয়েদের মত্‌ নেওয়া অত্যন্ত দরকার।"

অবনী বলিল, "অত্যন্ত।"

অবনী যাহা বলিল, সেটা সত্য-সত্যই তাহার প্রাণের কথা ; কিন্তু আজ হয়ত সে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করিত না, জগৎবাবুর আসল বক্তব্য যদি তাহার জানা থাকিত। সে মনে-মনে এই ভাবিয়াই

নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাহাকে জামাতা বা স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে জগৎবাবু বা ইন্দুলেখা কাহারোই অমত হইবে না ; কেননা, তাহার টাকাও আছে বিদ্যাও আছে !

জগৎবাবু একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "এখন আসল কথাটা পাড়া যাক্। আপনি যে আমার মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে চান, সে কথা আমি ইন্দুর কাছে তুলেছিলুম। কিন্তু—"

এই খট্‌খটে 'কিন্তু'টা অবনীর কাণে ভারি বেসুরো ঠেকিল ; চকিত চোখে সে জগৎবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

জগৎবাবু জ্বলন্ত কলিকার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ইন্দুর এতে মত্ নেই।"

অবনীর মুখ একেবারে এতটুকু !—আস্তে-আস্তে মাথা নোয়াইয়া বোবার মত সে চুপ করিয়া রহিল।

জগৎবাবু তাহার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "কি কর্‌ব বলুন, ইন্দুর মনে কষ্ট দিয়ে কোন কাজ কর্‌তে পারি না ত !"

উত্তরে অবনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহার তখনকার বিকৃত মুখে সে হাসিকে একেবারেই হাসি বলিয়া মনে হইল না। ইন্দুলেখা যখন তাহাকে বিবাহ করিবে না, তখন সেও জগৎবাবুকে দেখাইতে চায় যে, ইন্দুর প্রত্যাখ্যানে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই! অতএব, অবনী খবরের কাগজখানা সুমুখ হইতে তুলিয়া লইয়া কৃত্রিম মনোযোগের সহিত তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "ইন্দুর অমতের একটি কারণও আছে।"—বলিয়া তামাকের নলে টান মারিতে লাগিলেন।

কারণটা যে কি, জানিবার জন্য অবনীর প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাহিরে সে আর কোন আগ্রহই দেখাইল না,

কাগজের দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেম্‌নি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "আপনার মত জয়ন্তও আমার জামাই হোতে চান—"

—অবনীর বুকের ভিতর দিয়া যেন একটা আগুনের স্রোত বহিয়া গেল—

—"আর ইন্দুও জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌তে চায়! সুতরাং এক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা বুঝ্‌ছেন ত?"

ক্রোধের একটা দুরন্ত ঝট্‌কায় অবনী একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। টেবিলের দু'টো কোণ দু'-হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, অবনী প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল।

খানিক পরে, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনী বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

—"সেকি, এরি মধ্যে!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একটু দরকার আছে।"

—"অবনীবাবু, কিছু মনে কর্‌বেন না" মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া জগৎবাবু হাতদু'টি যোড় করিলেন।

—"কিছু মনে কর্‌বার অধিকার আমার ত নেই জগৎবাবু!"—চাপা অভিমানের স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া অবনী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।……

রাস্তায় খানিকদূর গিয়াই অবনীর সঙ্গে স্বর্ণেন্দুর দেখা।

স্বর্ণেন্দু তাহার সেই ঘোড়ার মত মুখে ইঁদুরের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে! জগৎবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছ বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"কেন, এরি মধ্যে চলে এলে বড় যে ?……ওকি, ভোট না পেলে মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের মুখের ভাব যে-রকম শোচনীয় হয়, তোমার মুখখানাও ঠিক তেম্‌নিধারা কেন হে ?"

—বলিতে-বলিতে স্বর্ণেন্দু তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল ; অবনী কিন্তু এক হ্যাঁচ্‌কায় নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "যাও, যাও, মিছে বকিও না !—"

স্বর্ণেন্দু একটু ভাবিয়া বলিল, "ও বুঝেছি !"

অবনী চোখ-মুখ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, "বুঝেছ ? ছাই বুঝেছ !"

স্বর্ণেন্দু হাসিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমি যদি না-বুঝি বন্ধু, তাহ'লে মিছেই তোমার সঙ্গে এতদিন মিশ্‌লুম ! কি হয়েছে বল্‌ব ? তুমি সেদিন ইন্দুলেখার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলে, আজ তার চরম জবাব পেয়েছ আর কি !"

—"পেয়েছি ত পেয়েছি, তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?"

—"কেন ? কারণ, সুপথে-কুপথে আমি তোমার একমাত্র বন্ধু কিনা !"

অবনী ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "জান স্বর্ণ, ইন্দু আমাকে বিবাহ কর্‌বে না সেও আমি সইতে পারি,—কিন্তু সে কিনা—সে কিনা" রাগের আবেগে অবনী তাহার কথা আর শেষ করিতে পারিল না !

—"কিহে, থাম্‌লে কেন ?"

—"ইন্দু জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌বে।"

—"অ্যাঃ, জয়ন্তকে !"—স্বর্ণেন্দু যেন আকাশ থেকে খসিয়া পড়িল।

জয়ন্তকে এরা দুই বন্ধুই দেখিত বিষদৃষ্টিতে। স্বর্ণেন্দুর মনে পড়িল,

জগৎবাবুর বৈঠকখানায় জয়ন্তের স্পষ্ট স্পষ্ট কথার দরুণ কতদিন কতবার তাহাকে সকলের সাম্‌নে অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। সুধুই কি তাই? কোনরকম তর্ক-আলোচনার সময়ে জয়ন্ত তাহাকে একেবারেই আমোল দেয় না, তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, স্বর্ণেন্দুকে সে যেন একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। সেই নিদারুণ উপেক্ষায় জয়ন্তের উপরে স্বর্ণেন্দুর সমস্ত মন বিরূপ হইয়া আছে।

তাহার কটারঙের গোঁফে মোচড়্ দিতে দিতে স্বর্ণেন্দু খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল; তারপর বলিল, দেখ অবনী, আমাদের চোখের উপরেই কলা দেখিয়ে জয়ন্ত যে ইন্দুকে ফস্ করে' বিয়ে করে' ফেল্‌বে, আর আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে বোবার মত তাই দেখ্‌ব, এ হোতে পারে না।"

—"তাই-বা দেখ্‌ব কেন? আজ থেকে আমি জগৎবাবুর বাড়ী ত্যাগ কর্‌লুম।"

—"কেন, খামকা অমন করে' হার মান্‌বার দরকার কি? বন্ধু, চোরের উপরে রাগ করে' ভুঁয়ে ভাত খেয়ে লাভ নেই। সংসার-অরণ্যে ঢুকে যদি সিংহের মত শীকার কর্‌তে চাও, তাহ'লে সর্ব্বদা শিয়ালের চাম্‌ড়ায় তোমাকে আগাপাশতলা ঢেকে রাখ্‌তে হবে! জয়ন্তকে ভালো করে' সম্‌ঝে দাও যে, আমরা তার উপেক্ষার পাত্র নই।"

—"স্বর্ণ, তুমি কি যে ছাই মাথামুণ্ডু বল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

—"শোনো। এ বিবাহ যাতে না-হয় সেই চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

—"কি করে'?"

—"সেইটেই ত আগে দেখা দরকার।"—বলিয়া, স্বর্ণেন্দু অন্যমনে একদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ শিষ দিতে লাগিল; তারপর হঠাৎ শিষ বন্ধ

আর, আজ তুমি এ কি বল্‌ছ! গৌরীকে তুমি বিবাহ কর্‌বে না।

এ বিবাহে তুমি যদি অমত কর, তাহ'লে কি হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছ? তাহ'লে আমার সত্যভঙ্গ হবে—গঙ্গাজল ছুঁয়ে যে সত্য আমি করেছি। তাহ'লে পরলোক থেকে গৌরীর মায়ের আত্মা অশান্ত হয়ে উঠ্‌বে,—হয়ত তার অভিশাপে তুমিও ইহলোক-পরলোক দুই হারাবে। তাহ'লে এ সংসারে থেকেও অভাগী গৌরী জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌বে।

তুমি কি তাই চাও? তুমি ত এমন ছিলে না, তবে কার চক্রান্তে পড়ে তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল? কোন্ কুহকিনীকে দেখে তুমি আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসেছ? সে কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কি নাম তার?……জেন, পৃথিবীতে রূপই বড় নয়, সংসারে আত্মসুখের চেয়েও বড় জিনিষ আছে।

আমি স্ত্রীলোক বলেই তুমি আমার অবাধ্য হোতে সাহস করেছ। উনি থাক্‌লে আজ তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে এতবড় অপমানটা কর্‌তে পার্‌তে না। স্ত্রীলোক কি এতই হেয়?

বাবা জয়, লক্ষ্মী মাণিক আমার,—এমন কাজ তুই করিস্‌নে! ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়, আমার কোলে ফিরে আয়—তোকে আর কল্‌কাতায় থাক্‌তে হবে না, তোর আর লেখাপড়ায় দরকার নেই। আমি তোকে গর্ভে ধরি-নি বটে, কিন্তু আমি তোকে যে স্নেহ যে ভালোবাসা দিয়েছি—কোন মা কি সন্তানকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারে?

তুই কি আমাকে বিমাতা বলে পর ভাবিস্? তাই হবে! তোর আচরণ দেখে আমারও মনে হচ্ছে জানিস্? মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভে জন্ম নিলে হয়ত তোর এমন কুমতি হোত না—আমার দেহের রক্ত তোর দেহে থাক্‌লে আজ হয়ত আমার বুকেই তুই এমন শেল হান্‌তে পারতিস্ না!

কিন্তু জয়, আমাকে তুই জানিস্ ত? আমি স্নেহ দিতেও জানি, শাসন করতেও জানি। তিনি যে উইল করে' গেছেন, তাতে সমস্ত বিষয়ের উপর আমারই সম্পূর্ণ অধিকার। এই পত্রেও তোর মন যদি না ফেরে, তাহ'লে তুই ত্যজ্যপুত্র হবি; সমস্ত বিষয় আমি গৌরীর নামে লিখে দিয়ে যাব। ইতি

তোর দুঃখিনী মা।

পুঃ। তোর চিঠির কথা শুনে গৌরী কি করছে জানিস্? কাঁদছে, খালি কাঁদছে।”

দুই করতলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল।...... তার মন তখন দোলনার মত দুলিতেছে—একবার এদিকে, একবার ওদিকে!

গৌরীর কান্নার অশ্রু তার মনকে বোধহয় সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কি সত্যসত্যই গৌরীকে ভালোবাসে?.........জয়ন্ত প্রাণপণে আপনার মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিল।......

না! সেখানে ইন্দুলেখার রূপের পূর্ণিমা পূর্ণজ্যোতিতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে! ইন্দু'র প্রত্যেক চাহনি, প্রতেক ভাবভঙ্গি, প্রত্যেক কথাটি পর্য্যন্ত তাহার বুকের ভিতরে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া আছে, তাহার সমস্ত দেহের রক্তে রক্তে যেন ইন্দু'র শত শত প্রতিমা নাচিয়া বেড়াইতেছে,—আর তাহার সমস্ত দেহ শত-শত নেত্র লইয়া সেইদিকে নির্নিমেষে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে!.........নাই—নাই, গৌরী সেখানে নাই!

হ্যাঁ, গৌরীকেও সে ভালোবাসে বটে—কিন্তু সে যে বোনের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা! সে ভালোবাসায় এ ভালোবাসায় যে অনেক—অনেক তফাৎ!

জয়ন্ত অনেক ভাবিল, কিন্তু তার হৃদয়ের ভাষা যে কথা বলিতেছে, তাহার সত্যতা কি করিয়া সে অস্বীকার করিবে!

মরুভূমে বর্ষাধারার মত, গৌরীর কান্নার অশ্রু জয়ন্তের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া আবার শুকাইয়া গেল!

হঠাৎ অন্নপূর্ণার পত্রের একটা জায়গা বিশেষ-কারয়া তাহার চোখে পড়িল। তিনি ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন।

ইন্দুকে ভালোবাসিয়া মনের ভিতর হইতে সে জোর পাইতেছিল বটে—কিন্তু এতক্ষণ বাহিরে কোন অবলম্বন পাইতেছিল না; এখন, পত্রের উপরে আর-একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার প্রাণ একেবারে রুখিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বিমাতা, তাই তিনি তাহার রক্তের দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ভধারিণীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! আর বিমাতা বলিয়াই তিনি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবার কথাটা মুখে আনিতে পারিয়াছেন। তিনি কি ভাবিয়াছেন, বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয়ে সে প্রাণের প্রার্থনা ভুলিয়া কুকুরের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদলেহন করিবে? না—কখনই না!……

দরজায় মুখ বাড়াইয়া ভজহরি ডাকিল, "খোকন, তোর আজ হ'ল কি? চাদ্দিকে রোদ খাঁ-খাঁ কর্‌চে, একনো মুখ-হাত ধুলি-নে!"

জয়ন্ত ডাকিয়া বলিল, "ভজা, ঘরের ভেতরে আয়, কথা আছে!"

ভজহরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া মেঝের উপরে উবু হইয়া বসিল।

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, চিঠিতে মা কি লিখেছেন জানিস্?"

—"কি লিকেচে খোকন?"

—"যদি গৌরীকে বিয়ে না-করি, আমি ত্যজ্যপুত্র হব।'

ভজহরি একেবারে লাফাইয়া উঠিল। অত্যন্ত উদ্বেগের স্বরে বলিল, "অ্যাঁঃ, সে কি রে!"

—"হুঁ্যা।"

—"তুই কি কর্‌বি তবে?"

—"গৌরীকে বিয়ে কর্‌ব না।"

—"সাধ করে' পথে বস্‌বি?"

—"হুঁ্যা, তোর ভয় হচ্ছে নাকি?"

—"ভয়! তুই হাসালি খোকন! তিনকাল গিয়ে আমার এক্কাল ঠেকেচে, আমার আবার ভয়? দুগ্‌গা—দুগ্‌গা! ওরে বোকা, আমি ভাব্‌চি তোর জন্যে।"

"আচ্ছা ভজা, আমার এই মা যদি বিমাতা না হতেন, তাহলে আমাকে ত্যজ্যপুত্র কর্‌বার কথা কি তিনি মুখে আন্‌তে পার্‌তেন?"

ভজহরি খানিক ভাবিয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা নয় রে খোকন, তা নয়! মা-ঠাক্‌রোণ যে গঙ্গাজল ছুঁয়ে পণ করেচেন গৌরী-দিদির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন! পাচে অধম্ম হয় সেই ভয়েই তোর ওপরে তিনি রাগ করেচেন! তিনি ত তোকে সৎমা'র মতন দ্যাকেন না ভাই! তোর অ্যাতটুকু বয়েস থেকে তিনি যে জয় জয় বলে অজ্ঞান, তোর সামান্যি অসুক হ'লে ভাব্‌নায় তাঁর চোকে যে জল আস্‌ত! আমার চোকে ধুলো দিয়ে তুই অ্যাক্‌বার পিদিমের কাচে গিয়েছিলি বলে মা-ঠাক্‌রোণ আমার সঙ্গে কদ্দিন কতা কন-নি—নেহাৎ পুরণো চাকর আর তুই আমার বড্ডই ন্যাওটা বলে সেবারে মানে-মানে আমার চাক্‌রিটা টেকে গ্যাল। সৎমা'র কতা মনে আনিস্‌-নে রে খোকন, মনে আনিস্‌-নে, এ মাকে বিমাতা বল্‌লে তোর মঙ্গল হবে না।"

জয়ন্তের মন আবার এলাইয়া পড়িল, বিছানার চাদরটা মুঠোর ভিতর পাকাইতে-পাকাইতে স্তব্ধ হইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সত্য! অন্নপূর্ণার ব্যবহারে আজ-পর্য্যন্ত কখনো বিমাতার বিমুখতা প্রকাশ পায় নাই। এমন-কি, কেউ না বলিয়া দিলে জয়ন্ত আজ জানিতেই পারিত না, তিনি তাঁর নিজের মা নন।

ভজহরি বলিল, "আর তোরই-বা এ কি ধনুকভাঙা পণ যে, তুই গৌরীকে বিয়ে কর্‌বি-নে! ব্যাচারী তোর কাচে কি দোষে দুষী, আমাকে বুজিয়ে দে দিকি অ্যাক্‌বার!"

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভজা, গৌরীর ত কোন দোষ নেই—কিন্তু তাকে বোন ছাড়া আর কিছু আমি বল্‌তে পার্‌ব না। বেশ, মা যদি বলেন, আমার বিষয়-সম্পত্তি আমি গৌরীকে দিচ্ছি, অতবড় বিষয় পেলে রাজার ঘরে গৌরীর বিয়ে হবে, তাই নিয়ে সে সুখী হোক্—মাও আমাকে ক্ষমা করুন।"

—"আর তোর কি হবে?"

—"আমি ইন্দুকে বিয়ে কর্‌ব"

—"বৌকে কি খাওয়াবি, পরাবি?"

—"নিজে রোজগার কর্‌ব, আমি পুরুষমানুষ, মূর্খও নই।"

ভজহরি সকাতরে জয়ন্তের কাছে আগাইয়া আসিল। তারপর তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে বলিল, "খোকন, নক্ষী ভাই আমার! তোর মায়ের কতায় কাণ দে, তাঁর আঁতে তুই অ্যাত-বড় ঘা মারিস্‌-নে!"

জয়ন্ত দু'-হাতে নিজের মাথার দু'-পাশ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তা আর হয় না ভজা! ইন্দুকে না-পেলে আমি—"

ভজহরি অবাক হইয়া দেখিল, জয়ন্তের চোখ অশ্রুজলে টস্‌টস্ করিতেছে! খোকনের চোখে জল! সে আর থাকিতে পারিল না, জয়ন্তকে কচিছেলের মতই দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওরে খোকন, আমার চোকের সাম্‌নে তুই কেঁদে ফেল্‌লি! না ভাই, তোর যা প্রাণ চায় তাই কর—আমি আর কোন কতা কইব না!"—এই বলিয়া সে ব্যাকুল ভাবে জয়ন্তের চোখের জল দুই হাতে মুছাইয়া দিতে লাগিল।

এগারো

চাঁদের আলোয় পাপিয়ার প্রাণে কবিত্ব জাগিয়াছে—তাহার সপ্ত-স্বরের লহরে-লহরে আজ রাতে তাই আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে।

একখানা ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসিয়া ইন্দুলেখা একমনে পাপিয়ার সেই সুখের গান শুনিতেছিল।

জয়ন্ত নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গায়ের উপর ছায়া পড়িতেই ইন্দু বলিয়া উঠিল, "জয়ন্তবাবু বুঝি? আজ সারাদিন আপনাকে একবারও দেখ্‌তে পাই-নি কেন? ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ুন। শুনুন, পাপিয়া কেমন গান গাইছে! আচ্ছা জয়ন্তবাবু, পাপিয়ার গলায় ষড়জ থেকে নিখাদ পর্য্যন্ত সব স্বরগুলোই বেরোয়—না? দেখুন না, ওর ডাক্ কি ঠিক এম্‌নি নয়?" এই বলিয়া ইন্দু সারেগামায় পাপিয়ার নকল করিতে লাগিল, —'সা—আ, রে—এ, গা—আ, মা—আ'—প্রভৃতি!

জয়ন্ত জবাব দিল না।

ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া একবার এদিকে আর-একবার ওদিকে ঘাড় কাৎ করিয়া জয়ন্তকে দেখিয়া বলিল, "উঃ! আজ যে দেখ্‌চি জয়ন্তবাবুর মুখ 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের চেয়েও গম্ভীর! ব্যাপার কি,—কথাও কবেন না, বস্‌বেনও না, এ কেমন ধারা!"

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া চাঁদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তারপর সঙ্কুচিত স্বরে কহিল, "ইন্দু, তোমার হাসি-ঠাট্টা আজ ভালো লাগ্‌ছে না।"

ইন্দু ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া সেই অল্প আঁধারে জয়ন্তের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি হয়েছে জয়ন্তবাবু?"

কোনরকম ভূমিকা না-করিয়া জয়ন্ত একেবারে বলিয়া ফেলিল, "দেশ থেকে আমার মা লিখেছেন, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহ'লে ত্যজ্যপুত্র হব।"

জয়ন্তের অগোচরে ইন্দুলেখার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মাথা হেঁট্ করিয়া সেই চাঁদের আলোয় আপন ছায়ার দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "আমার অবস্থা ত বুঝ্‌ছ ইন্দু, তোমাকে যদি বিয়ে করি, তাহ'লে আমাকে খেটে খেতে হবে। এমন গরীবকে তুমি—"

ইন্দু বুঝিল, জয়ন্তের কথার শেষটা কি! হঠাৎ মাথা তুলিয়া সে কহিল, "থাক্, আর বল্‌বেন না। আমাকে কি আপনি এতই নীচ মনে করেন?"

যে দুর্ভাবনাটা এতক্ষণ শক্ত দড়ির মত জয়ন্তের মনটাকে আষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দুর এই এক উত্তরেই সে বাঁধনটা ছিঁড়িয়া গেল। হাঁপ ছাড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "ইন্দু, ইন্দু, আমি ত্যজ্যপুত্র হ'লেও তুমি আমাকে—"

খুব মৃদু স্বরে ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্ত নন্দিত কণ্ঠে বলিল, "তাহ'লে সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তোমার পাশ থেকে আমি এক-পাও নড়্‌ব না!"

ভরা-পূর্ণিমার চাঁদ তখন ইন্দুর মুখের উপরে পরিপূর্ণ লাবণ্যের ধারা ঢালিয়া দিতেছে—তাহার মুখের রঙের সঙ্গে জ্যোৎস্নার রং যেন এক-হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত বিভোর হইয়া সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে, নির্ণিমেষনেত্রে। ইন্দুর মুখেও আর কথা ফুটিল না।

এরই মধ্যে জগৎবাবু যে কখন্ সেখানে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাহা টের পায় নাই!

স্নেহভরে খানিকক্ষণ দু'জনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জগৎবাবু শেষটা হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দু, জয়ন্ত, তোমরা কি আজকাল বসে-বসেই ঘুমাবার অভ্যাস করেছ? এ অভ্যাস ভালো নয় গো ভালো নয়, কারণ পাশ ফিরতে গেলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা!"

তখন তাদের সাড় হইল,—দু'জনেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু বলিলেন, "তোমাদের ঘুমের মাঝখানে আমি একটা মস্ত দুঃস্বপ্নের মত এসে পড়লুম,—নয়?"

জয়ন্ত লজ্জিত ভাবে বলিল, "আপনি এসেছেন আমরা জান্‌তে পারি-নি, ক্ষমা করবেন।"

"এতে ক্ষমা করবার কিছু নেই জয়ন্ত! তোমাদের এযে জেগে ঘুমাবারই বয়স! যৌবন হচ্ছে একটা দীর্ঘ নিদ্রা—এর স্বপ্ন হচ্ছে চাঁদের আলো, পাখীর গান, ফুলের গন্ধ! যতদিন পার সুখে ঘুমিয়ে নাও—কারণ এমন দিন আস্‌বে যেদিন সংসারের বিষাক্ত দংশনে আচম্বিতে এ নিদ্রা টুটে যাবে, তখন চারিধারে চেয়ে দেখ্‌তে পাবে সুধু ধু-ধু করছে তপ্ত মরু! সেখানে ভয়ে পাখী ডাকে না, ফুল ফোটে না, জ্যোৎস্নার রস শুকিয়ে যায়! জয়ন্ত, জীবন বড় ছোট—যৌবন আরো ক্ষণিক!" —বলিয়া, জগৎবাবু ইন্দুর পাশে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।..... ইন্দু তাহার পিতার একখানি হাত লইয়া আঙুলগুলি আস্তে-আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জয়ন্ত বলিল, "জগৎবাবু, আপনার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে।"

জগৎবাবু জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে চাহিয়া

বলিলেন, "জয়ন্ত, তোমরা একালের যুবক, হ'লে কি? আমাদের যখন বয়স ছিল তখন দরকারি কথা কাকে বলে আমরা তা জানতুমই না! এমন-কি বাজে কাজ আর বাজে কথা আমরা এত-বেশী ভালো-বাসতুম যে, কর্ত্তাদের দল আমাদের ভবিষ্যতে অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু দেখ্‌তে পেতেন না! তোমার ঐ 'বিশেষ দরকারি কথা' শোনবার জন্যে এখন আমার একটুও আগ্রহ নেই, এমন পূর্ণিমাকে তুমি 'দরকারি কথা'র খোঁচায় হত্যা কোরো না এই আমার অনুরোধ!"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি যদি এখন একটি গান গাও, তাহ'লে তোমার 'বিশেষ দরকারি কথা'র চেয়ে সেটা আমি বেশী মন দিয়ে শুনব।"

—"জগৎবাবু, আমি কর্ত্তব্যের জন্যেই আপনাকে এতটা বিরক্ত কর্‌ছি।"

—"তুমি জ্বালালে দেখ্‌ছি! নাও বাপু নাও, এই আমি কাণ খাড়া করে' রইলুম—তাড়াঁতাড়ি তোমার কর্ত্তব্যপালন করে' নাও!"

—"আমার মা চিঠি লিখেছেন, আমি যদি আপনার মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ'লে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির কিছুই আমি পাব না।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "সে কি! এ বিবাহে কি তাঁর মত্‌ নেই?"

—"না।"

জগৎবাবুর সমস্ত অবহেলার ভাব ছুটিয়া গেল। ভালো করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "কেন?"

জয়ন্ত কিছুই লুকাইল না—একে-একে সব কথা খুলিয়া বলিল।

জগৎবাবু অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "তুমি এখন কি কর্‌বে বলে ঠিক করেছ?"

—"মায়ের কথা মত কাজ-করা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব।"

—"কিন্তু আমি হ'লে এখানে মায়ের কথা-মতই কাজ কর্তুম্।"

—"বিষয়-সম্পত্তি কি এতই বড়!"

—"না, কর্ত্তব্যের জন্যে।"

—"কিন্তু তাতে কি কর্ত্তব্যপালন হবে জগৎবাবু? আমি যদি খন গৌরীকে বিবাহ করি, তাহ'লে আমিও সুখী হব না—সেও য়!"

জগৎবাবু কোন সাড়া দিলেন না, আবার ভাবিতে লাগিলেন। এমন সমস্যায় তিনি আর কখনো পড়েন নাই!

খানিক পরে বলিলেন, "আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ না দি, তাহ'লে তুমি ত মার কাছেই ফিরে যাবে?"

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

জয়ন্তের মুখের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া জগৎবাবু বুঝিলেন, এ-কথা তার খাঁটি প্রাণের কথা। ইন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে তখন তাঁহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া, বারান্দার রেলিংএ ভর্ দিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

জগৎবাবু বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার বোধ হয় তোমার মা এতটা কঠিন হ'তে পার্বেন না যে, সত্যসত্যই তোমাকে ত্যজ্যপুত্র কর্বেন। হয়ত দু'দিন পরে তাঁর রাগ পড়ে যাবে, তখন তোমার অবস্থা বুঝে তিনি তোমাকে ক্ষমা কর্তেও পারেন। সে যাই হোক্—তুমি বিষয় পাও আর না-পাও, আমি তোমার হাতেই ইন্দুকে সঁপে দেব। কারণ, তা ছাড়া আর উপায় নেই, আমার মেয়ের মন ত আমি জানি—সে যে তোমাকে বড় বেশী আপন বলে ভাবে! ওর চোখের জল আমি ত সইতে পার্ব না!"

জয়ন্তের মনে শেষ যে খট্‌কাটুকু লাগিয়া ছিল, এতক্ষণে তাও ঘুচিয়া গেল।

চেয়ারের উপরে আবার আড়্ হইয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আঃ!..... ছাখ জয়ন্ত, এমন যে মূর্ত্তিমান কবিতার মত সুন্দর জ্যোৎস্না, তোমার দরকারি কথার দৌরাত্ম্যে তার অনেকখানি বাজে খরচ হয়ে গেল! সৌন্দর্য্যের অপচয়কে আমি একটা বড় পাপ বলে মনে করি। নাও, শীগ্‌গির একটা গান গেয়ে তোমার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত কর!"

জয়ন্ত গান ধরিল—জগৎবাবু ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিতে লাগিলেন। এবং খানিকপরে ঘাড়-নাড়া বন্ধ করিয়া বেমালুম ঘুমাইয়া পড়িলেন!

বারো

অন্নপূর্ণা অনেকদিন হইতে বুকের ব্যামোয় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার এই অসুখটা মাঝে-মাঝে বেশ আরাম হইয়া যায়, মাঝে-মাঝে আবার চাড় দিয়া উঠে। অন্নপূর্ণা যখন-তখন তাই হাসিয়া বলিতেন, "আমার দেহে জীবন আর মরণ দু'-ভায়ের মতন একসঙ্গে বাস করছে। ভায়ে ভায়ে যেদিন আর বনিবনাও হবে না, সেদিন আমার এই দেহ-ঘর ভেঙে যাবেই যাবে!"

সংপ্রতি অসুখটার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

দুপুরবেলায় অন্নপূর্ণা শুইয়াছিলেন; পাশে বসিয়া গৌরী শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেছিল। এমন সময় তাঁহার নামে একখানা চিঠি আসিল।

অন্নপূর্ণা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ের চিঠি?"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অন্নপূর্ণা ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া গৌরীর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

জয়ন্ত লিখিয়াছে:—

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলুম। কিন্তু মা, আপনি এত-বেশী রাগ করেছেন যে, আপনাদের কুশল-সংবাদ কিছুই দেন-নি; এমন-কি আমাকে আশীর্ব্বাদ করতেও ভুলে গেছেন। এথেকে আমি বুঝতে পারছি, আমি এখনি আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি; এর পর আপনার বিষয় থেকে আমাকে যদি বঞ্চিত করেন, তবে সে আঘাতটা আমার বুকে এর-চেয়ে বেশী নিদারুণ হয়ে বাজবে না।

জান্‌বেন, আমি যে সঙ্কল্প করেছি, সে সঙ্কল্প এখনো ত্যাগ করি-নি; আপনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন শুনে আমার সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়েছে।

আপনার রক্ত আমার গায়ে নেই বলে আপনি আমার রক্তের দোষ দিয়েছেন। দোষ-গুণ জানি না, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আপনার রক্ত যদি সত্যই আমার গায়ে থাকৃত, আমি যদি আপনার পেটের ছেলে হতুম, তবে ত্যজ্যপুত্রের কথা নিশ্চয় আপনি মুখের আগেও আন্‌তে পারতেন না। কিন্তু আমার সঙ্গে ত আপনার শোণিত-সম্পর্ক নেই,—আমার মা যে আজ পরলোকে।

গৌরীকে বল্‌বেন, তাকে আমি চিরকাল বোনের মতই ভালোবাস্‌ব। আপনার সম্পত্তি পেয়ে সে যেন আমার অভাব ভুলে আর কারুকে বিবাহ করে' সুখে-শান্তিতে থাকৃতে পারে ; এই আমার প্রার্থনা।

আশা করি, সবাই ভালো আছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি— জয়ন্ত।"

জয়ন্তের পত্র হাতে করিয়া অন্নপূর্ণা অচল-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন —বসিয়াই রহিলেন। ডাক্তারের অস্ত্রাঘাতে রোগীর পা-দু'টো যখন ছিন্ন হইয়া যায়, রোগী যেমন তখনো ব্যাপারটা বুঝিয়াও সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না যে, তাহার পা আর নাই—তার দেহ এখন একটা অচল মাংসপিণ্ড মাত্র ; অন্নপূর্ণার অবস্থাও এখন অনেকটা সেই রকমের! জীবনহীন শবের মত তাঁহার মুখখানা বুকের উপরে এলাইয়া পড়িল এবং সে মুখের দিকে চাহিয়া, পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গৌরীর আর বিলম্ব হইল না। দুই হাতে মাটি আঁকৃড়াইয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙিয়া অন্নপূর্ণা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "জয়ের মুখ থেকে আজ আমাকে এতবড় কথাটা শুন্‌তে হ'ল! সে

...চে পেটে ধর্‌লে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র করতে পার্‌তুম না! হা ...ান, এতদিনেও সে আমাকে চেনেনি, এখনো সে আমাকে বিমাতা ...হ করে! জয়, ওরে জয়, ছেলেরা যখন বড় হয় তখন এম্‌নি ...'ই কি মাকে ভুলে যায় রে!"—অন্নপূর্ণার চোখের পাতা প্রাণের ...ায় ভিজিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "...ারাণদাসী!"

বাহির হইতে ঝী সাড়া দিল, "ক্যানো মা!"

—"দেওয়ান-মশাইকে ডেকে আন্‌।"

খানিক পরেই দেওয়ান কালীশঙ্কর লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ ও গলা খক্‌খক্‌ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। অন্নপূর্ণা বধূবেশে ...ন এ বাড়ীতে প্রথম আসেন, তখন হইতেই তিনি এই সাম্‌নের-দিকে ...কে-পড়া থুথুড়ো বুড়ো দেওয়ানটিকে ঠিক এম্‌নি ভাবেই দেখিতে- ...ন। কালীশঙ্করকে কেউ বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "...মিদারীর হিসাব নিকাশ করে' এমন সময় পাই না যে, নিজের বয়সের ...াখরচ রাখতে পারি!"—চুলের সঙ্গে কালীশঙ্করের বুদ্ধিটিও এমন ...াকিয়া উঠিয়াছে যে, জমিদারীর সমস্ত ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিয়া অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। দেওয়ান-মশাইকে এ-বাড়ীর বৌ-ঝী কেউই লজ্জা করে না, তাই বাড়ীর যেখানে সেখানে যখন-তখন তাঁহার পাকা বাঁশের লাঠির ঠক্‌ঠকানি এবং সর্দ্দিভরা গলার খক্‌খকানি শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া কালীশঙ্কর কিঞ্চিৎ হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বুকে হাত দিয়া খানিকক্ষণ হাঁপ্‌ ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "হঠাৎ ডাক্‌ পড়্‌ল কেন মা, তোমার অসুখ কি বেড়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না। জয়ের চিঠি এসেছে।"

ঘরের মেঝের উপরে হাতের ভর্ রাখিয়া বসিয়া কালীশঙ্কর বলিলেন, "খোকাবাবু কি লিখেছেন?"

—"গৌরীকে সে বিয়ে কর্‌বে না।"

কালীশঙ্কর খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে গৌরীর দিকে করুণ চোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন; সে বেচারী তখন আড়ষ্ট-ভাবে বসিয়া-বসিয়া ক্রমেই ঘামিয়া উঠিতেছে!

কালীশঙ্কর হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এবারেও সেই এক কথা! তাঁর মাথায় এমন কুবুদ্ধি কে দিচ্ছে? কি বল মা, একবার কল্‌কাতায় যাব নাকি? তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি, যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি!"

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, আমি উইল কর্‌ব—তারই বন্দোবস্ত দেখুন।"

কালীশঙ্কর ভয়ে-ভয়ে অন্নপূর্ণার পাথরের মত কঠিন মুখের পানে তাকাইয়া খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন। উইলে কি থাকিবে তিনি তা জানিতেন।

সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "একবার কল্‌কাতায় গেলে দোষ কি?"

অন্নপূর্ণা কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না—অল্পবয়স হইতে কর্তৃত্ব করিয়া করিয়া তাঁহার এম্‌নি স্বভাব হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার কথার উপরে কেউ কথা কহিলেই তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেন। কালীশঙ্করের কথায় তাই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না! জয়কে আমার চেয়ে আপনি কি বেশী জানেন? সে যা ধরেছে তা কর্‌বেই!"

কালীশঙ্কর অত্যন্ত দমিয়া গিয়া মুখে হাত-চাপা দিয়া আবার কাশি

সুরু করিলেন। তারপর ভয়ে-ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "এ বাড়ীর বংশধর হয়ে শেষটা কি সে পথে বস্‌বে—"

—"হ্যাঁ, আমার পেটের ছেলে হ'লে আজ তাকে একেবারেই পথে বসাতুম! বারবার আপনি এককথা বল্‌ছেন, কিন্তু জয় কি লিখেছে জানেন? লিখেছে, আমি তার বিমাতা—তাই—" রাগে দুঃখে অন্নপূর্ণার মুখে আর বাক্য সরিল না।

কালীশঙ্কর কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে ক্রমাগতই কাশিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা আপনাকে একটু সাম্‌লাইয়া আবার বলিলেন, "সে যদি আমাকে তার নিজের মা বলে ভাব্‌ত, তাহ'লে আমি তাকে আমার বিষয়ের একটা কাণাকড়িও দিতুম না। কিন্তু সে এখন আমাকে বিমাতা বলে ভাবে, তাই তাকে আমি একেবারে পথে বসাব না, গৌরীকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক বিষয় আমি তাকেই লিখে দেব। সে বুঝুক, আপন মায়ের চেয়ে আমার মত বিমাতার দরদ কত বেশী!—যান, আপনি উইলের বন্দোবস্ত করুন-গে যান!"

কালীশঙ্কর আর কথা কহিতে ভরসা পাইলেন না; আস্তে-আস্তে উঠিয়া লাঠি ঠক্‌ঠক্ ও গলা খক্‌খক্ করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আজ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া গেল, তিনি আজ একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন; তাঁহার স্পন্দন-রোহিত চোখ ঠেলিয়া আজ যে সজল হাহাকার বাহির হইয়া আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তিনি তাহাকে থামাইয়া রাখিলেন।

গৌরীর দিকে ফিরিয়া ব্যথাভরা স্বরে বলিলেন, "গৌরী, মা, আমারও

সত্যভঙ্গ হ'ল, তোকেও সুখী কর্‌তে পারলুম না। জানিনা এ কার অদৃষ্টের দোষ—তোর, না আমার ?"

গৌরীর পাণ্ডুর মুখ ক্রমেই মাটির দিকে নুইয়া পড়িতে লাগিল।

মমতাভরে গৌরীর মাথার উপরে একখানি হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন, "মা, জয়কে তুই ভুলে যা! তার মন কাঁচের মত—তাতে ছায়াই পড়ে, দাগ পড়ে না। নইলে আপন হাতে যাকে মানুষ করেছি, সে আজ আমার আপন না-হয়ে আমারি শত্রু হয়ে দাঁড়াল!"

কাতর নয়নে একবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া, গৌরী আচম্বিতে মেঝের উপরে টলিয়া পড়িয়া গেল!

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি তাহার দিকে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "নারাণদাসী, অ নারাণদাসী, শীগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে আয়—শীগ্‌গির! গৌরী অজ্ঞান হয়ে গেছে—নারাণদাসী, নারাণদাসী!"

তেরো

স্বর্ণেন্দু আজকাল জয়ন্তের সঙ্গে বড়-বেশী ঘনিষ্ঠতা সুরু করিয়াছে— সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা সব-সময়েই যখন-তখন সে জয়ন্তের বাসায় আসে-যায়, গান শোনে, গল্প করে। তাহাকে হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর এতটা পছন্দ হইল কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না-পাইয়া জয়ন্ত মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইত। বাস্তবিক, জয়ন্তকে দেখিলেই যে-স্বর্ণেন্দু মুখ গোম্‌ড়া করিয়া থাকিত, সেই স্বর্ণেন্দু আজকাল তাহার সঙ্গে যেমন দরাজ প্রাণে মিশিতেছে, সেটাকে পুরোদস্তুর মোসাহেবী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

আরো-বিচিত্র এই যে, স্বর্ণেন্দুর বেচাল দেখিলে জয়ন্ত আগেকার মতই নির্দ্দয়ভাবে তাহার প্রতি চোখাচোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে, তবু কিন্তু তাহার মুখে আহত হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

এই গেল-কাল সে এক রাজা-উজীর-মারা গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, সে গল্পের নায়ক হইয়াছিলেন তাহার সেই মে[illegible]মামা! গল্পটা যখন অবাধ কল্পনার চরমে উঠিয়াছে—অর্থাৎ তাহার মেজমামার হীরা-বসানো আংটি দেখিয়া বড়লাট-সাহেব যখন হাঁ-করিয়া থ হইয়া আছেন—তখন জয়ন্ত আর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না-পারিয়া দু'-হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন্ স্বর্ণেন্দুবাবু, থামুন্, থামুন! আপনা[illegible] মেজমামার বিচিত্র জীবনচরিত অনায়াসে হজম কর্‌তে পারি, আমা[illegible] ধৈর্য্যের বহর তত বেশী লম্বা নয়—যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষান্ত দিন!"

স্বর্ণেন্দু তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত তাহার মেজমামা[illegible] আশ্চর্য্য আংটি এবং বিস্মিত-স্তম্ভিত বড়লাট সাহেবের বর্ণনা বন্ধ করি[illegible]

ফেলিল। তারপর তাহার কুৎকুতে চোখদু'টো মট্‌কাইয়া, একটা ঢোঁক্ গিলিয়া এবং একগাল হাসিয়া বলিল, "ও আপনার ভালো লাগ্‌ছে না বুঝি ?"

—"না। বাঙালীর রচিত জীবনচরিত আর মাসিক-পত্রের প্রবন্ধ-গৌরব, এ-দু'টো জিনিষ জ্যান্ত মানুষের ধাতে সহ্য হওয়া অসম্ভব।"

—"হ্যাঁ, আমার মেশোমশাই—গ্যালো বছরে যিনি সি-আই-ই হয়েছেন জানেন ত,—তিনিও বলেন মাসিকপত্রের—"

—"রক্ষা করুন স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার মেজমামার পিছনে-পিছনে যদি সি-আই-ই মেশোমশাইও এত ঘনঘন আবির্ভূত হন, তাহ'লে আমাদের দশা রাম-রাবণের মাঝখানে মারীচের চেয়েও ভয়ানক সাংঘাতিক হয়ে উঠবে যে!"

স্বর্ণেন্দু আর-কোন কথা কহিল না,—ফস্-করিয়া পকেট হইতে রূপার 'কেস্' বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তাহার মনের কথা তাহার মনই জানে, কিন্তু বাহিরে সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই হাসিমুখে বসিয়া রহিল।

আসল কথা, জয়ন্ত এই স্বর্ণেন্দু লোকটাকে অতিশয় ঘৃণা করিত—কারণ তাহার টাকার জাঁক্ যেমন বেশী, মিথ্যাকথা কহিবার শক্তিও তেম্‌নি। স্বর্ণেন্দু যাহাতে তাহার উপরে চটিয়া মেলা-মেশা বন্ধ করিয়া দেয়, জয়ন্ত সেই ফিকিরে প্রায়ই তাহাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত ;—কিন্তু স্বর্ণেন্দুও যেন অপ্রস্তুত হইবে না বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিত! জয়ন্ত যত কড়া কথা বলে স্বর্ণেন্দুও তত মুখ টিপিয়া হাসে, এবং প্রত্যহ যথানিয়মেই আপনার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে আসিয়া বসে! আর-সকলে ভাবিত, ওঃ, এযে দেখ্‌চি যীশুখৃষ্টের মত ক্ষমাশীল এবং কম্‌লীর মত নাছোড়বান্দা!

কাল্‌কের সেই 'মেজমামার আশ্চর্য্য আংটি'র ব্যাপারের পর জয়ন্ত ভাবিয়াছিল, স্বর্ণেন্দু অন্তত আজকের দিনটা তাহার নিয়মিত হাজিরিতে কামাই দিবে।

কিন্তু আজ সকালে জয়ন্ত যখন তানপুরা লইয়া গলা সাধিতেছিল, তখন দ্বারপথে স্বর্ণেন্দুর হ্যাট্‌-কোট্‌-পরা বকের মত কৃশ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেল।

স্বর্ণেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ডান-হাতের একটা আঙুল কপালে ছুঁয়াইয়া হাস্যমুখে বলিল, "গুড্ মর্ণিং জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত মাথাটি নত করিয়া বলিল, "নমস্কার। স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি চলেন-বলেন সায়েবী-ধরণে অথচ আজ-পর্য্যন্ত কেতাদুরস্ত হ'তে পার্‌লেন না!"

—"কেন জয়ন্তবাবু, এমন কথা বল্‌লেন কেন?"

—"ভদ্রলোকের ঘরে ঢুক্‌লে সায়েবেরা কি মাথায় টুপি পরেই ঢোকে?"

মাথা হইতে হ্যাট্‌টা তখনি খুলিয়া ফেলিয়া আধহাত জিভ্ বাহির করিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ঐ যাঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল মশাই, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল!"

—"ভুল ত হবেই! দেশে বসে দেশকে ভুল্‌তে চাইলে ভুল হবে না কি সুখে আপনারা যে অমন ধড়া-চূড়ো পরেন, আপনারাই তা জানেন!"

—"আর যা-বলুন তা-বলুন, কিন্তু ও-কথা বল্‌লে চল্‌বে না জয়ন্তবাবু! সায়েবী পোষাকে সুবিধে ঢের, চল্‌তে কোঁচা বাধে না, কসি খুলে যায় না, আর—আর—"

তানপুরাটা নামাইয়া রাখিয়া জয়ন্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর-আর?"

—"আরো ঢের সুবিধে আছে—"

—"যেমন, গ্রীষ্মকালে মনে হবে টার্কিস্‌বাথের গরম সিন্দুকটা ঘাড়ে করে' বয়ে বেড়াচ্ছি, সতরঞ্চে বা ফরাসের ওপরে বস্‌তে গেলে মনে হবে যেন আমি গেঁটে বাতে'র আড়ষ্ট রোগী! ঐ কলার,—কুকুরের কলারের চেয়েও যা টাইট্ হয়ে গলায় বসে' হাঁপ ধরায়, ঐ রাতের পোষাকের প্লেট্‌বসানো সার্ট,—দেহকে যা সর্ব্বদাই দরজার মত সটান খাড়া থাক্‌তে হুকুম দেয়, ঐ পায়ের জুতো,—নেমন্তন্নে গিয়ে যার ফিতে খুল্‌তে-খুল্‌তেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যায়, এ-সবও ত আপনি সুবিধে বলে মনে করেন?"

—"হ্যাঁ, একটু-আধ্‌টু অসুবিধে আছে বটে—"

—"একটু-আধ্‌টু কি, ও-পোষাকে বাঙালীর পনেরো-আনাই অসুবিধে, সায়েবরা শীতের দেশে প্রাণের দায়ে অমন পোযাক পর্‌তে বাধ্য হয়েছে বৈ ত না! আমাদের এই চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়ার দেশে, পোষাক-পরিচ্ছদও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে! দেখুন, আমাদের এই কোঁচানো চাদর,—এ-যেন ভাঁজে-ভাঁজে ছ[illegible]রে-পড়া শতদল; এই গিলে-করা পাঞ্জাবীর আস্তীন,—এ-যেন [illegible]খেলানো নদীর মত; এই মোলায়েম কাপড়,—এ-যেন পূর্ণিমার শুভ্র[illegible]-মাখানো; এই কোঁচার রঙিন মুখ,—এ-যেন পাপ্‌ড়ি-মেলিয়ে-দেওয়া একটি ফুল! স্বর্ণেন্দুবাবু, আমাদের পোষাক দেখ্‌লে আপনার ও সায়েব-আর্টিষ্টরাও আর্টের আদর্শ বলে মান্‌তে বাধ্য হবেন! আবার এই পোষাকে যদি বৈচিত্র্য আন্‌তে চান তাহ'লে নানা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পোষাকও অনায়াসে রঙে ছুপিয়ে নিতে পারেন,—বর্ষাকালে ভিজে বনের মত তাজা সবুজ রং, শরৎকালে পাকাধানের মত সোনালী রং, বসন্তকালে বাসন্তী রং, গ্রীষ্মকালে রোদে-শুক্‌নো মাটির মত গেরুয়া

রং, এম্‌নি যখন যেমন তখন তেমন। এ পোষাকের কাছে কোথায় লাগে আপনার ও দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ!”

—“ওঃ, জয়ন্তবাবু, আপনার কথাগুলো প্রায় কবিতার রূপ নিয়ে গেছে! কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না যেন, যে, জীবনের সবটাই কবিতার মত কোমল নয়!”

জয়ন্ত সে কথা কাণে না তুলিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, “পুরো সায়েবী পোষাক বরং সহ্য হয়, কিন্তু আমরা—বাঙালীরা যে অদ্ভুত পোষাকটাকে জাতীয় করে' তুলেছি, সেটা স্থচের মত চোখকে বিঁধতে থাকে। আমরা অনেকে পায়ে পরি মস্ত বুট, তার ওপরে এদেশী কাপড়, তার ওপরে সায়েবী সার্ট বা কোট—কেউ কেউ আবার গলা-খোলা কোটের সঙ্গে নেকটাই আর কলার পর্‌তেও লজ্জা পান না—তার ওপরে কোঁচানো চাদর—কেউ কেউ দেখি মাথায় আবার টুপি পর্‌তেও সুরু করেছেন! কাপড়ের ওপরে সায়েবদের ‘ড্রেসিং গাউন’ পরে' অনেককে দেমাকে বুক-ফুলিয়ে সদর রাস্তায় চরে' বেড়াতেও দেখেছি! আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের যে কতটা অধঃপতন হয়েছে, আমাদের জাতীয়তা যে কত নীচে নেমে পড়েছে, আর, সেইসঙ্গে আমাদের নির্লজ্জতা যে কতটা চরমে উঠেছে, বাঙালীর এই ‘ফে[illegible]-বঙ্গ-বেশে’র কিম্ভূতকিমাকার খিচুড়ি তার অকাট্য প্রমাণ!”

স্বর্ণেন্দু বলিল, “কিন্তু আপনি আমাকে ও-দলে ফেল্‌তে পারবেন না! কাপড়ের সঙ্গে আমি কখনো সার্ট-কোট পরে পথে বেরুই-নি।”

জয়ন্ত আর-কিছু না-বলিয়া তানপুরাটি তুলিয়া লইয়া একটি ভজন ধরিল।

স্বর্ণেন্দু একপাশে বসিয়া গান শুনিতে শুনিতে মুরুব্বিআনা চালে তুড়ি মারিয়া বেতালা তাল দিতে লাগিল।

জয়ন্ত যখন থাম্‌লিল, স্বর্ণেন্দু বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোফা, তোফা! আপনার গান শুন্‌লে প্রাণটা যেন মাৎ হয়ে যায়! সত্যি জয়ন্তবাবু, আপনার এই গান শুন্‌তে পাব বলেই রোজ সকালে এখানে এসে তীর্থের কাকের মত বসে থাকি!"

জয়ন্ত জানিত, কিছুদিন আগে এই স্বর্ণেন্দুর কাছেই তাহার গান ছিল অত্যন্ত অশ্রাব্য! অকস্মাৎ তাহার এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণটা বুঝিতে না-পারিয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

স্বর্ণেন্দু একখানা এসেন্সমাখা সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখের কাছে নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "অবিশ্যি এ-দেশে আপনার চেয়ে বড় আর নামজাদা গাইয়ে ঢের আছেন; কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকের গান থেকেই আমি রস পেয়েছি।"

—"ওর কারণ আছে। এদেশের অনেক গাইয়েই গানের মধ্যে সুরকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করে' তোলেন, কথাকে একেবারেই আমোল দেন না। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, কেবল সুরই যদি গানের সর্ব্বস্ব হ'ত, তাহ'লে কণ্ঠসঙ্গীতের কোনই সার্থকতা থাকৃত না—যন্ত্র-সঙ্গীতেই সে কাজটা ভালো করে' চল্‌তে পার্‌ত। সুরের সঙ্গে কথাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যেই যখন কণ্ঠ-সঙ্গীতের সৃষ্টি, গানে তখন সুর আর কথা—কেউই ফেল্‌না নয়, এ সত্য আমি কখনো ভুলি না!"

স্বর্ণেন্দু খানিকটা চুপ্‌চাপ্ বসিয়া উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। তারপর একটা সিগারেট ধরাইয়া, জয়ন্তের মুখের দিকে না-চাহিয়াই বলিল, "আমি একটি লোককে জানি মশায়, সে যে কি চমৎকার গায়, তা আর কি বল্‌ব!"

—"কি গান তিনি?"

—"টপ্পা, খেয়াল। বড়-বড় রাজা-মহারাজা তার গান শুন্‌তে

লায়িত। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনাকে একবার তার গান নিয়ে আনি।”

—“বেশ ত!”

স্বর্ণেন্দু খুব খুসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আচ্ছা, কালই সন্ধ্যার সময় এসে আপনাকে আমি নিয়ে যাব।”

—“তাঁর নাম কি?”

কিন্তু স্বর্ণেন্দু বোধহয় শুনিতে পাইল না; কারণ জয়ন্তের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়াই সে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

চৌদ্দ

পরদিন ঠিক্ সন্ধ্যার মুখে স্বর্ণেন্দুর গাড়ী আসিয়া জয়ন্তের বাসার সুমুখে দাঁড়াইল।

জয়ন্ত কাপড়-জামা পরিয়া তৈরি হইয়াই ছিল। স্বর্ণেন্দুর সাড়া পাইয়াই উপর হইতে নামিয়া আসিল। জয়ন্তকে তুলিয়া লইয়া স্বর্ণেন্দু গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল।

ঘরমুখো জ্যান্তে-মরা কেরাণীর দলকে শশব্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া, অনেকগুলো রাস্তা পার হইয়া স্বর্ণেন্দুর গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটের একখানা তিনতলা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া থামিল। বাড়ীর দরজার কাছে একজন দ্বারবান বসিয়া বাঁ-হাতের চেটোতে ডান-হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ্ দিয়া 'গুকা' পিষিতেছিল, গাড়ী দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মস্ত এক সেলাম ঠুকিল।

জয়ন্ত বাড়ীর বাহিরটার এবং দ্বারবানটার দিকে একবার বিস্মিত চোখে চাহিয়া বলিল, "এই বাড়ী নাকি ?"

স্বর্ণেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে এ গায়কটির বেশ দু'-পয়সা আছে দেখ্‌ছি।"

—"রাজা-মহারাজকে গান শুনিয়ে যে হাত করেছে তার আবার টাকার ভাবনা! এখন নামুন,—কথাবার্ত্তা সব ভেতরে গিয়ে হবে-অখন।"

গাড়ী হইতে নামিয়া দু'জনে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। উঠানে একজন মুসলমান চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাদের পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল।

জয়ন্ত চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এই গাইয়েটি কি মুসলমান ?"

স্বর্ণেন্দু বলিল, "হ্যাঁ। বাঙালীর ভেতরে ভালো গাইয়ে কোথায় পাবেন ?"

মুসলমান চাকরটা একটা ঘরের দরজা হইতে পুঁতির পরদা সরাইয়া দিল। স্বর্ণেন্দুর পিছনে-পিছনে জয়ন্তও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

স্বর্ণেন্দু একটা জান্‌লার দিকে আঙুল তুলিয়া বলিল, "আপনি ঐ জান্‌লাটার কাছে গিয়ে বসুন। বেশ হাওয়া পাবেন।"

জয়ন্ত সেইখানে গিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর ঘরের চারিদিকে কৌতুহলী চোখ বুলাইয়া সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল।

ঘরখানি বেশ সাজানো-গুছানো। ঘরের মেঝেটি রঙ-চঙে মাদুরে মোড়া, তার উপরে পুরু ও নরম গালিচা, তার উপরে মাখনের মত সাদা চাদর, তার উপরে কতকগুলো মোটা মোটা তাকিয়া, একটা রূপার গড়্‌গড়া, রূপার পিক্‌দান ও পানের ডিবা। পঙ্কের কাজ-করা দেওয়ালের দু'দিকে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি দু'খানা বড়-বড় আয়না। আয়না দুখানার উপরে-নীচে দু'টো-করিয়া ব্রাকেট; উপরের ব্রাকেটে এক-একটি পোর্সিলেনের পুতুল এবং নীচে এক-একটি রূপার ফুলদানিতে ফুলের তোড়া! ঘরের ছাদের মাঝখানে একটা ছোট ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড় ও পাখা। এ-সব দেখিয়া জয়ন্তের মুখের ভাব বদ্‌লাইল না,—কিন্তু দেওয়ালের ছবিগুলোর উপরে চোখ পড়িতেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিরক্তির সহিত ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার গায়কটি সুধু বিলাসী নন, তাঁর রুচিও ভারি জঘন্য ত!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "কেন ?"

ছবিগুলোর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জয়ন্ত বলিল, "এমন ছবি ভদ্রলোকের ঘরে থাকা উচিত নয়।"

একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া তাহার উপরে বুক রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ওঃ, তাই ও-কথা বল্‌ছেন ? আর্টিষ্টদের রুচি অম্‌নি একটু তরল হয়েই থাকে।"

জয়ন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি তাহ'লে আর্টের কিছুই বোঝেন না। আর্ট হচ্ছে—"

* স্বর্ণেন্দু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চুপ্‌ চুপ্‌! আর্টের ওপরে লেক্‌চার যা দিতে হয় বাইরে বেরিয়ে দেবেন! শুন্‌ছেন না, কে আস্‌চে!"

জয়ন্ত শুনিল, বাহির হইতে কাহার গহনার ঠুন্‌ঠুনানির সঙ্গে পায়ের চটিজুতার মৃদু আওয়াজ আসিতেছে! সে অবাক হইয়া দরজার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে তাকাইয়া রহিল।

... ... জয়ন্তকে একেবারে হতভম্ব করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল এক অপূর্ব্বরূপসী যুবতী—তাহার [illegible] কটাক্ষ, ওষ্ঠে হাস্যের লীলা!

জয়ন্তের মুখের উপরে ঢুলে-পড়া তৃষাভরা চোখদু'টি রাখিয়া যুবতী সাম্‌নে একটু হেলিয়া একটা সেলাম করিল। কিন্তু জয়ন্ত তখন এম্‌নি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল যে সেলাম ফিরাইয়া দিবার কথাটা বেবাক্‌ ভুলিয়া, বসিয়া রহিল ঠিক এক কাঠের পুতুলের মত!

স্বর্ণেন্দু বলিয়া উঠিল, "আরে দুয়ো জয়ন্তবাবু, মেয়েমানুষ দেখে লজ্জা! ইনি হচ্ছেন হুস্‌না-জান, আপনি যে এঁরই গান শুন্‌তে এসেচেন!"

জয়ন্তের বুকের ভিতরটা গুরগুর করিয়া উঠিল—স্বর্ণেন্দু তাহা

গান শুনাইতে আনিয়াছে! স্বর্ণেন্দুর দিকে আগুনভরা দৃষ্টি-করিয়া জয়ন্ত তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণেন্দু অর্থপূর্ণ চোখে বাইজীর দিকে চাহিয়া কি-একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, উঠ্‌লেন যে!"

দরজার দিকে আগাইতে-আগাইতে গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বলিল, "বাড়ী যাব!"

স্বর্ণেন্দু আড়্‌চোখে বাইজীকে আবার কি একটা ইসারা করিল।

অনেকগুলো আংটি-পরা হাতখানি রং-মাখানো ঠোঁটের উপরে চাপিয়া বাইজী খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল! তারপর পরিষ্কার বাঙলায় বলিল, "বাবুসাহেব, বস্‌তে হুকুম হোক্‌!"

কোন জবাব না-দিয়া, বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়াই জয়ন্ত মাথা হেঁট করিল—তাহার মনে হইল, সে-দু'টো চোখের খর দৃষ্টি যেন দু'-দু'টো অগ্নিশিখার মত তার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধাইয়া দিতেছে!

বাইজী হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া খপ্‌ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া গানের সুরে বলিয়া উঠিল—

"আজ ময়েঁ লড়ুঙ্গি
পিয়াকো যানে ন দেউঙ্গি!"

একটা গোখ্‌রো সাপ হঠাৎ হাত জড়াইয়া ধরিলে মানুষ যেমন করে, জয়ন্ত ঠিক তেম্‌নি করিয়াই বাইজীর হাতখানা আপন হাত হইতে [illegible] ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিদ্যুতাহতের মত পিছনে হটিয়া আসিল।

[illegible] ঠোঁটদু'খানি ফুলাইয়া বাইজী অভিমানের সুরে বলিল, "বাবুসাহেব, আমার গা বড় নরম—আপনি আমাকে ব্যথা দিলেন।"

জয়ন্ত যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানেই অবশ দেহে ধুপ্‌-করিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে!.....

পনেরো

আলবোলার নলটি মুখে লাগাইয়া জগৎবাবু স্তিমিত চক্ষে সোফার উপরে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া ধোঁয়ার দু'টি শাদা রেখা ফুটিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া জান্‌লার দিকে উড়িয়া যাইতেছিল।

তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মাণিক একখানা পত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। জগৎবাবুর হাতে পত্রখানা দিয়া বলিল, "একজন লোক এসে এই চিঠি-খানা দিয়ে গেল। বল্‌লে, জরুরি চিঠি।"

চিঠিখানা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "কার চিঠি এ? কোত্থেকে এসেছে, তা বল্‌লে না?"

—"না হুজুর! দিয়েই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।"

তামাকের নল ফেলিয়া জগৎবাবু ভালো করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর টেবিলের উপর হইতে চশ্‌মার খাপ্‌খানা তুলিয়া লইয়া, চশ্‌মা বাহির করিতে গিয়া দেখেন, খাপ্ খালি। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও চশ্‌মা নাই।

—"মান্‌কে!"

—"হুজুর!"

—"আমার চশ্‌মা কোথায় গেল?"

—"জানি না, হুজুর!"

"ছাখ্ দেখি, নীচে পড়ে গেছে কিনা!"

মাণিক টেবিল, চেয়ার, সোফার তলা ও ঘরের আশপাশ আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়া বলিল, "চশমা নেই হুজুর!"

জগৎবাবু খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "নেই ত গেল কোথায়?"

—"জানি না হুজুর!"

—"আল্‌বৎ জানিস্! দেখ্‌ছিস্ জরুরি চিঠি, জানি না বল্‌লেই হোলো? দে, চশ্‌মা বার করে' দে!"

—"আমার কাচে নেই হুজুর!"

—"আল্‌বৎ আছে! নেই বল্‌লেই হোলো! থাপ্ রইল টেবিলে আর চশ্‌মা গেল উড়ে? চশ্‌মার ডানা আছে—না?"

বেগতিক বুঝিয়া মাণিক কাঁচুমাচু মুখে মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিল।

জগৎবাবুর মেজাজ ক্রমেই বেশী গরম হইতে লাগিল। সপ্তমে গলা চড়াইয়া তিনি বলিলেন, "পাজী, চোর কোথাকার! বলা নেই কওয়া নেই—চোখের সাম্‌নে চশ্‌মা লোপাট্, দিনে ডাকাতি? বার কর্ চশ্‌মা!"

—"জানি না হুজুর!"

জগৎবাবু সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া রুখিয়া বলিলেন, "এম্‌নি এক চড় মারব মান্‌কে, যে মাথাটা তোর ঘুরে যাবে! খালি-খালি এককথা—চালাকি পেয়েছিস্, না?"

হঠাৎ জগৎবাবুর কপালের উপরে চোখ পড়িতেই মাণিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হুজুর, চশ্‌মা ত আপনার কপালেই রয়েছে!"

কপালে হাত বুলাইয়া জগৎবাবু দেখিলেন, অ্যাঁ, তাই ত! তখন তাঁহার মনে পড়িল, খবরের কাগজ-পড়া হইয়া গেলে পর, চশ্‌মাখানা নাকের উপর হইতে টানিয়া সরাইয়া তিনি কপালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। বেকুব বনিয়া তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং অপ্রতিভ বলিলেন, "মাণিক, কিছু মনে করিস-নে বাবা!"

[illegible] ভৃত্য মাণিকচাঁদ জো পাইয়া মুখখানা কাঁদোকাঁদো করিয়া বলিল, "হুজুর আমাকে চোর বল্‌লেন !"

—"বড্ড ভুল হয়ে গেছে মাণিক, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! আচ্ছা, আচ্ছা,—যাও !" বলিয়া, পকেটে হাত পুরিয়া জগৎবাবু তিনটি টাকা বাহির করিয়া, সশব্দে মেঝের উপরে ফেলিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের বুঝিতে একটুও দেরি হইল না যে, টাকা-তিনটি তাহারই বখ্‌শীষ! কেননা, এমন লাভ তাহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে;—ধমক, চড়্‌চাপড় এবং বখ্‌শীষ দিতে জগৎবাবুর মত সমান-তৎপর লোক অন্য-কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ!

চশ্‌মাখানা ফের নাকের ডগায় নামাইয়া জগৎবাবু চিঠিখানা খুলিলেন; তাতে লেখা ছিল:—

"জগৎবাবু,

আপনার মঙ্গলের জন্যে এই পত্র লেখা হচ্ছে।

আপনি যার হাতে কন্যা-সম্প্রদান করবেন, সেই জয়ন্তের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত কদর্য্য; আপনার অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি,—অথচ, এক বাইজীর সঙ্গে তার বিশেষ মাখামাখি আছে। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে সেই বাইজীর বাড়ীতে গিয়ে সে গানবাজনা করে' থাকে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহ'লে আপনি এখনি—নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে সেই বাইজীর বাড়ীতে গেলে জয়ন্তের দেখা পাবেন।"

পত্রে লেখকের নাম-ধাম কিছুই ছিল না।

জগৎবাবু পত্রখানা হাতে-করিয়া জড়ীভূতের মত বসিয়া রহিলেন।

এও কি সম্ভব? জয়ন্ত,—যার স্বভাবে, ভাবে-ভঙ্গিতে, কথায়-বার্ত্তায় আজ-পর্য্যন্ত তিনি কোন খুঁৎ দেখিতে পান নাই,—সে কিনা—সে কিনা—আরে ছ্যাৎ, এ হ'তেই পারে না!

জগৎবাবু আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন,—"না, এ সমস্তই
মিথ্যে !"

কিন্তু পত্রের শেষে এ কি লেখা রহিয়াছে ? বৌবাজারে বাইজীর
বাড়ীতে এখনি গেলে জয়ন্তের দেখা পাওয়া যাইবে !

জগৎবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আপন মনে বলিলেন, "হুঁঃ,
তাকে অমনি পেলেই হ'ল কিনা ! এ উড়ো-চিঠি নিশ্চয় কোন
হিংসুটে বদ্‌লোক পাঠিয়েছে !"—একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন,
"আচ্ছা, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্, একবার খোঁজ নিয়ে এলে মন্দ কি ?
মনের ভেতরে মিছে একটা ধোঁকা রাখা কিছু নয় !"

জগৎবাবু চিঠিখানা আবার খামের ভিতরে পূরিয়া হাঁকিলেন,
"মাণিক !"

মাণিকচাঁদ তখন চাকর-মহলে মেঝের উপরে পা-ছড়াইয়া
বসিয়া কর্ত্তার চশ্‌মা-চুরি ও তাহার বখ্‌শীষ-লাভের কাহিনী
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিতেছিল,—কর্ত্তার ডাক্ শুনিয়া সাড়া দিল,
"হুজুর !"

—"শীগগির গাড়ী জুত্‌তে বল্ !"

—"আচ্ছা হুজুর !"

জগৎবাবু মনের ভিতরে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস লইয়া গাড়ীতে গিয়া
উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে পর, সহিস যখন
বাইজীর বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন উপর হইতে গানের শব্দ
পাইয়া জগৎবাবু গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া যাহা দেখিলেন,
তাহা স্বপ্নাতীত !

ইলেক্‌ট্রিকের আলোকে রাস্তা হইতে দ্বিতলের একটা ঘরের ভিতর
পরিষ্কার পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল ! সেখানে নারীকণ্ঠে গান হইতেছে—

এবং সেইদিকে বাজ্‌না ও পায়ের ঘুঙুরের শব্দও শোনা যাইতেছে। আর, সেই ঘরেরই একটা জান্‌লার কাছে বসিয়া আছে,—জয়ন্ত!

জগৎবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার চাহিয়া দেখিলেন,—হ্যাঁ, ও মূর্ত্তি জয়ন্তেরই।

তাঁহার চোখ যেন পুড়িয়া গেল, বিকৃতস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন, "এই! গাড়ী থামাও!"

ষোলো

হার্মোনিয়ামের সামনে ইন্দুলেখা মাসিকপত্রের স্বরলিপি দেখিয়া একটা গান অভ্যাস করিতেছিল, এমন সময়ে জগৎবাবু সজোরে ধাক্কা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

—"উঃ, অত জোরে কি দরজা খুল্‌তে হয়, বাবা? একেবারে চম্‌কে গিয়েছিলুম!"

—"তোর বাজ্‌না থামা ইন্দু!"

পিতার গলার স্বর শুনিয়া, বাজ্‌না বন্ধ করিয়া ইন্দুলেখা অবাকমুখে চাহিয়া রহিল।

—"ওঃ, মানুষ এমন কপট হ'তে পারে—এতদিন আমি কোন সন্দেহ কর্‌তে পারি-নি!"

—"কি হয়েছে বাবা?"

—"হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! কি আশ্চর্য্য, দুনিয়ায় লোক-চেনা দায়!"

—"হ্যাঁ বাবা, তুমি কার কথা বল্‌ছ?"

জগৎবাবু ঘরের ভিতরে এলমেল পায়ে ঘুরিতে-ঘুরিতে আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অ্যাঁ, আমার মেয়েকে আরেকটু হ'লেই পথে বসিয়েছিলুম ত! ভগবান ভারি বাঁচিয়ে দিয়েছেন!"

ইন্দুলেখার বুকটা কি-এক অশুভ আশঙ্কায় দুপদুপ্‌ করিয়া উঠিল। কাতর স্বরে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, বল না, কি হয়েছে?"

জগৎবাবু হঠাৎ ইন্দুর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জানিস্ ইন্দু, জয়ন্তের সঙ্গে তোর বিবাহ হওয়া অসম্ভব!"

অসম্ভব! কেন,—কিছুই না-বুঝিয়া ইন্দু ফ্যাল্‌ফেলে চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল!

—"জানিস্, জয়ন্ত খারাপ স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যায়,—সে দুশ্চরিত্র!" ইন্দুর প্রাণটা যেন দমিয়া বুকের ভিতরে বসিয়া গেল—সে নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; ফস্-করিয়া বলিয়া ফেলিল, "না বাবা, না—এ মিছে কথা!"

—"মিথ্যেকথা! তুই কি আমাকে মিথ্যেবাদী বলতে চাস্ ইন্দু? আমি যে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলুম!"

ইন্দুর মুখ মোমের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এলাইয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে বলিল, "তুমি দেখে এলে? তুমি?"

—"হ্যাঁ, আমি—আমি। জয়ন্ত দুশ্চরিত্র—তার সঙ্গে তোর বিবাহ? সে হয় না ইন্দু!"—এই বলিয়া জগৎবাবু ঘর ছাড়িয়া অস্থির পদে আবার বাহির হইয়া গেলেন।

স্তব্ধ ও স্থির হইয়া ইন্দু সেইখানে বসিয়া রহিল।.........

বহুদূরের তিমিরে লিপ্ত প্রাসাদ-শ্রেণীর উপরে অতি-ধীরে রক্তরাঙা চন্দ্রলেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে বাগানের উপর হইতে অন্ধকারের পরদা আস্তে-আস্তে সরিয়া যাইতেছে এবং ঘরের সামনেই একটা বকুলগাছ বাতাসে থর্-থর্ কাঁপিয়া আকুলস্বরে মর্-মর্ করিয়া উঠিতেছে!

চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি, খাবার তৈরি হয়েচে!"

ইন্দু তার স্বরে চমকিয়া উঠিল; ধমক্ দিয়া বলিল, "কি চাস্ তুই?"

—"খাবার তৈরি হয়েচে!"

—"যা, চলে যা এখান থেকে! আমি খাব না!"

চাকরটা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দু তেম্নি ভাবে অনেকক্ষণ ঠায় বসিয়া রহিল।……তারপর ধীরে-ধীরে উঠিয়া আগে দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। কিন্তু ঘর তবু অন্ধকার হইল না—বাহির হইতে দুরন্ত একটি মেয়ের মত, হাস্যময়ী জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

ইন্দু একে-একে সমস্ত জান্‌লা ভেজাইয়া বাহিরের সমস্ত আলো-কে ঘর হইতে নির্ব্বাসিত করিল। ঘরের বাহিরে শব্দময়ী, গীতিময়ী, দীপ্তিময়ী ধরণী; ঘরের ভিতরে সুধু নিস্তব্ধ, নিবিড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার!……

সে অন্ধকার তাহার দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত এবং চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠিল!

* * * *

ইন্দুর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া জগৎবাবু বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে তখন অনেক লোকজন আসিয়া জমিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের গোল টেবিলের চারিধারে বসিয়া জন-চারেক ভদ্রলোক 'ব্রিজ্' খেলায় অত্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন; আর-এক কোণে কৈলাসবাবুর সাম্‌নে বসিয়া অবনী দাবার ছকের উপরে বিভোরভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জগৎবাবুকে দেখিয়া কৈলাসবাবু বলিলেন, "এই যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?"

—"বাড়ীর ভেতরে"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া জগৎবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের ভিতরে সবাই তখন খেলায়

তন্ময় হইয়া আছে,—তাই জগৎবাবুর মুখের অস্বাভাবিক ভাব কাহারো নজরে ঠেকিল না।

মাণিক আসিয়া আল্‌বোলার মাথায় কল্‌কে চড়াইয়া দিয়া গেল।

জগৎবাবু চিন্তিতমুখে মাঝে-মাঝে তামাকে এক-একটি টান্ দিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল!

জগৎবাবু এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন,—জয়ন্তকে দেখিয়াই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নমস্কার করিয়াই জয়ন্ত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়াও জয়ন্ত!"

যাইতে-যাইতে জয়ন্ত আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু তেম্‌নি স্বরে বলিলেন, "ছাখ জয়ন্ত, ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে না-গেলে আমি সুখী হব!"

ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বলিল, "কি বল্‌ছেন!"

—"ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে আর না-ঢুক্‌লেই আমি সুখী হব।"

—"আপনি এই কথা বল্‌ছেন!"

—"হ্যাঁ, আমার অন্তঃপুরে দুশ্চরিত্রের প্রবেশ নিষেধ।"

জয়ন্তের মুখ পাঙাশ হইয়া গেল। জগৎবাবু কি তাহা হইলে—

—"তুমি যে এত অসৎ আমি তা জানতুম না। ছিঃ, ছিঃ, যাকে আমি সরল প্রাণে অনায়াসে আমার অন্তঃপুরে ঢুক্‌তে দিয়েছি, সে কিনা অভদ্র ইতর স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গিয়ে—"

বাধা দিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে জয়ন্ত বলিল, "দেখুন জগৎবাবু, এ-সব কথা আপনি আমাকে গোপনে বল্‌তে পার্‌তেন।"

—"তাতে আবশ্যক ? আমি ইচ্ছে করেই সকলের সাম্‌নে এই কথা তুলেছি। লুকোচুরিকে আমি ঘৃণা করি। দশজনের সাম্‌নে আমি তোমার মুখোস খুলে দিতে চাই ! আজ থেকে তুমি আমার সদর মহলে আর পাঁচজনের মতই আসতে-যেতে পার—তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমার বাড়ীর ভেতরে আর তুমি যেতে পার্‌বে না।"

ঘরের ভিতরে ততক্ষণে সকলের খেলা-ধূলো সব ঘুরিয়া গিয়াছে—লোকগুলির মুখ দেখিলে মনে হয়, এরা-সবাই যেন আকাশ হইতে সগু-সগু খসিয়া পড়িয়াছে !

বিশেষ-করিয়া দেখিবার মত হইয়াছিল, অবনীর মুখ ! বিস্ময়, ঘৃণা ও আনন্দ প্রভৃতি নানা ভাবের আভাসে তাহার মুখখানা এম্‌নি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে মুখ অনায়াসে একজন ভালো চিত্রকরের চিত্রাদর্শ হইতে পারিত !

জয়ন্ত একবার সকলকার মুখের উপরে কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "জগৎবাবু, অকারণে আমাকে অপমান কর্‌বেন না, আগে আমার কথা শুনুন—"

—"অকারণে ! তুমি কি বল্‌তে চাও অকারণে আমি তোমাকে এ-সব কথা বল্‌ছি ?"

—"নিশ্চয়। আমি নির্দ্দোষ।"

—"কী ! তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী ! জানো, আমি স্বচক্ষে তোমাকে কুস্থানে দেখে এসেছি।"

—"তা দেখ্‌তে পারেন। কিন্তু, আমি সেখানে গিয়ে থাক্‌লেও—"

—"থাক্, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না।"

—"জগৎবাবু !—"

—"চুপ্। তোমার কপটতা অসহ্য। আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে।"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, আমি চল্লুম। কিন্তু যে অপমান আজ আমাকে কর্‌লেন তার জন্যে পরে আপনাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে। আমি নির্দ্দোষ।"—বলিতে-বলিতে জয়ন্তের চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া সে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে সকলে তখনো হাঁ-করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে।

সকলের আগে অবনী মুখ খুলিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, জয়ন্তবাবুর চরিত্র এত খারাপ!"

জগৎবাবু আল্‌বোলার নলটা আবার তুলিয়া লইয়া তিক্ত-বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "থাক্, ও আলোচনায় আর কাজ নেই, অন্য কথা বলুন।"

অবনী আর-কিছু না-বলিয়া একটুখানি ঠোঁট্-টেপা হাসি হাসিয়া, আবার দাবার ছকের উপরে হেঁট্ হইল;—জয়ন্তের অপমানে তাহার মত খুসি আজ এখানে আর কেউ হয় নাই!

সতেরো

এলমেল পায়ে জগৎবাবুর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া জয়ন্ত যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রাগে দুঃখে অপমানে তখন তাহার আর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। দিশেহারার মত সাম্‌নে সে যে রাস্তা পাইল সেইদিকেই আপনমনে চলিয়া গেল। এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ সে এ-পথে সে-পথে ঘুরিতে লাগিল;—কতবার লোকের গায়ের উপরে পড়িয়া যা-তা গালাগালি খাইল, একবার একখানা গাড়ীর সুমুখে গিয়া পড়াতে গাড়োয়ান ছিপ্‌টি মারিয়া তাহার গণ্ড ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল—জয়ন্ত আজ কিন্তু কিছুতেই উচ্চবাচ্য করিতেছে না। তাহার বুদ্ধি এবং অনুভব-শক্তি আজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

গভীর নিশীথে গীর্জ্জার ঘড়ীটা আচম্‌কা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! পথে তখন লোকজন নাই বলিলেও হয়; কেবল একটা মাতাল গ্যাস্‌পোষ্টে ঠ্যাসান্ দিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া নেশার ঘোরে আপনমনে ঝিমাইতেছিল; হঠাৎ গাড়ীর শব্দে চম্‌কাইয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিল, "এই, চ্যাচাস্‌-নে—চ্যাচাস্‌-নে, অনেক কষ্টের নেশা বাবা, এক্ষুনি চট্‌-করে' চটে যাবে!"—বলিতে বলিতে গ্যাস্‌পোষ্ট ধরিয়া রাস্তার উপরেই সটান লম্বা হইয়া পড়িল।

তখন জয়ন্তের খেয়াল হইল। বুঝিল, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, ভজহরি এখনো তাহার জন্য জাগিয়া বসিয়া আছে। এমন ভাবে পাগলের মত পথে-পথে ঘুরিয়া মরিয়া লাভ কি?......তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে আবার বাড়ীমুখো হইল।

জয়ন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা মস্ত চক্রান্ত হইয়াছে। নইলে স্বর্ণেন্দু আজ খাম্‌কা তাহাকে বাইজীর বাড়ীতে লইয়া যাইবেই-বা কেন, আর তাহার সেখানে যাওয়ার খবর জগৎবাবুই-বা এত-শীঘ্র টের পাইবেন কি-করিয়া ?······কিন্তু স্বর্ণেন্দুর এতে স্বার্থ কি ? আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত আন্দাজ করিল, এর-মধ্যে অবনীরও হাত আছে ; অবনী ইন্দুকে বিবাহ করিতে চায়, সে-ই তার পথের কাঁটা হইয়াছে ; তাই অবনী তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দুর সাহায্যে আজ তাহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে ! জয়ন্ত যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ ততই দৃঢ় হইয়া উঠিল ; হ্যাঁ, আজ্‌কের ব্যাপারের মূলে আছে, ঐ অবনী !·········

সারারাত অনিদ্রায় কাটাইয়া, খুব ভোরবেলায় জয়ন্ত যখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, ধরণীর মুখ হইতে তখনো কালো ছায়ার ঘোম্‌টা খসিয়া পড়ে নাই। পূর্ব্বতোরণে প্রাতঃসন্ধ্যার আরতি-প্রদীপে তখন আলোর ক্ষীণ শিখাটি সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং নীলগগনের ছেঁড়া মেঘের ভাঙা আসরে চিরমৌন শুকতারাটি করুণ নয়ন মেলিয়া পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে।

জয়ন্ত আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া ভোরের হাওয়ায় তাহার চিন্তাক্রান্ত প্রাণ অনেকটা শান্ত হইল ! আস্তে-আস্তে সে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ জগৎবাবুর বাড়ীর বাগানের দিকে চোখ পড়িতেই সে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাস্‌নাহানার সবুজ ঝোপের পাশে, ঠিক একটি প্রতিমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া ইন্দু একলাটি দাঁড়াইয়া আছে।

ডুবু-ডুবু লোক যেমন-করিয়া দূরের নৌকার দিকে তাকাইয়া থাকে, তেম্‌নি করিয়া জয়ন্তও ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ইন্দুও নিশ্চয় পিতার মুখে সমস্ত শুনিয়াছে—আজ তাহার হৃদয়ে হয়ত তার আর একটুও ঠাঁই নাই—তাহার চোখে সে এখন নিষ্ঠুর প্রতারক বৈ অন্য-কিছু নয়! জয়ন্তের মনটা হা-হা করিয়া উঠিল।

তারপরেই সে ভাবিল, 'আচ্ছা, মিথ্যা এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের শান্তিসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌ব কেন? ইন্দু ত জানে না, চক্রীর চক্রান্তে পড়ে আজ আমার এই বদ্‌নাম! তার কাছে যদি সমস্ত খুলে বলি, সে কি আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে না? আমি কি তার চোখে এতটা নীচু হয়ে পড়েছি?'… ..

আরো-খানিক্ ভাবিয়া জয়ন্ত স্থির করিল, সে এখনি ইন্দুর কাছে গিয়া তাহার ভুল ভাঙিয়া দিয়া আসিবে! ইন্দু বিশ্বাস করুক্ না-করুক্, সে পরের কথা।

জয়ন্ত তখনি নীচে নামিয়া গেল।

বাগানের ফটক তত-সকালে খোলা ছিল না। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া জয়ন্ত দেখিল, ইন্দু তখনো ঠিক সেইখানটিতে তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

কম্পিত, সঙ্কুচিত স্বরে জয়ন্ত ডাকিল, "ইন্দু!"

ইন্দু চমকিয়া পিছন ফিরিল। জয়ন্তকে এ সময়ে এখানে দেখিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না; সমস্ত ভুলিয়া ঠিক আগেকার মতই হাসিমুখে তাড়াতাড়ি তাহাকে কি বলিতে গিয়াই সে আবার থামিয়া পড়িল। —গেল কাল্‌কের সেই ব্যাপারটার কথা মনে হওয়াতে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! জড়-সড় হইয়া চুপ-করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল

জয়ন্ত বলিল, "ইন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ফটকটা একবার খুলে দেবে?"

ইন্দু কি যে করিবে, বুঝিতে পারিল না। সে জানিত জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহার পিতা রাগ করিবেন; অথচ জয়ন্ত যে চোখের সুমুখে তাহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবে, এও ত সে প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারিবে না!

ইন্দুর ইতস্ততঃ দেখিয়া জয়ন্ত সমস্ত বুঝিল। অভিমানে তাহার মনটা ফুলিয়া উঠিল—অ.ক্ষেপভরে বলিল, "থাক্ ইন্দু থাক্, থাক্, আর আমার বল্‌বার কিছু নেই—স্রোতের শেওলার মত তোমাদের কাছে আমি ভেসে এসেছিলুম—আবার ভেসেই চলে যাব—আমি তোমাদের কোথাকার কে!"

মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া মিনতির স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত তাহার কথায় কাণ না দিয়াই বলিল, "তোমার বাবা আমার ওপরে অবিচার করেছেন আর তুমিও আমার কি বল্‌বার আছে তা না শুনেই কুকুর-বিড়ালের মত আমাকে—"

গভীর যাতনায় ইন্দুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন জয়ন্তবাবু, থামুন! এমন কথা আর বল্‌বেন না, আপনি ভিতরে আসুন—আমি ফটক খুলে দিচ্ছি!"

ইন্দু আগাইয়া গিয়া ফটকের অর্গল খুলিয়া দিল।

ফটক ঠেলিয়া জয়ন্ত ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছে, সহসা উপর হইতে ক্রুদ্ধ—তিরস্কারের স্বর আসিল—"ইন্দু!"

সচমকে দুই জনেই উপরে চাহিয়া দেখিল, বারান্দার রেলিং ধরিয়া

জগৎবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে !

আকাশের মেঘের উপরে তখন প্রদীপ্ত আলোক-পদ্মের মত সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সুধু অন্ধকার আর অন্ধকার ! নতমুখে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জয়ন্ত, তুমি আর যাই হও—আমি তোমাকে অন্তত ভদ্রলোক বলেও জানতুম !"

জয়ন্ত আর দাঁড়াইল না—কালুকের অপমানের উপরে আবার এই অপমানে পাগলের মত হইয়া, দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

... ...

জয়ন্ত যখন নিজের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার দেহের রক্ত ফুটন্ত তেলের মত তপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়াইয়া দিতেছে।

অবশ হইয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া, দুই চোখ বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ সে চুপচাপ রহিল—চাপা আবেগের নিশ্বাসে বুকখানা তাহার ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

খানিক পরে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া, দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে বলিল, "না—এমন চুপ করে' থাকা চল্‌বে না—আমি এখনি আবার জগৎবাবুর কাছে যাব—তাঁর মেয়ের সঙ্গে তিনি আমার বিবাহ দিন আর না-দিন—আমি তাঁকে যেমন করে' পারি বুঝিয়ে দেবই দেব, যে আমি কোন দোষে দোষী নই !"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিল, একখানা টেলিগ্রামের লেপাফা হাতে করিয়া ভজহরি উপরে উঠিতেছে।

সাম্‌নেই বাধা পাইয়া জয়ন্তের মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ভজহরি বলিল, "খোকন, তোর নামে একটা তার এসেচে রে!"

—"টেলিগ্রাম! কোত্থেকে?"

—"আমি ত আর তোর মতন অ্যাংরেজি-পড়া পণ্ডিত নই, তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল! এই নে—পড়্!"

ভজহরি টেলিগ্রামখানা জয়ন্তের হাতে অর্পণ করিল।

জয়ন্ত কম্পিত ভীত হস্তে টেলিগ্রামের মোড়ক্ ছিঁড়িয়া ফেলিল—কেন না, বাঙালীর সংসারে তারবার্ত্তায় ভালো খবর পাওয়া যায় খুব কম।

টেলিগ্রামে শুধু লেখা ছিল—

"অন্নপূর্ণা মৃত।"

—"মাগো!"—বলিয়া জয়ন্ত সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মন হইতে সমস্ত অপমানের কথা, জগৎবাবু ও ইন্দু'র কথা ঢেউয়ের টানে খড়-কুটোর মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

ভজহরি খবর শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল—জয়ন্তের ভাব দেখিয়া তাহার বুক উড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলিল, "অ খোকন, অমন করে' উঠ্লি ক্যানো, কি হয়েচে, বল্ ভাই, বল্!"

জয়ন্ত ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওরে ভজা,—মা আর নেইরে!"

"—অ্যাঁ, মা-ঠাক্‌রোণ? মা-ঠাক্‌রোণ নেই?"—ভজহরি স্তম্ভিত হইয়া গেল!

শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে অন্নপূর্ণাকে কত মূর্ত্তিতেই জয়ন্ত দেখিয়াছে, তাঁহার স্নেহে যত্নে প্রেমে হৃদয় তাহার কাণায়-কাণায় ভরিয়া আছে—সেই-সব তাহার চোখের সুমুখে এক-লহমায় যেন আকার ধরিয়া বিদ্যুতের

মত খেলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা মুখে তাহাকে যতই কড়া কথা বলিয়া থাকুন, তবু সে জানে তিনি তাহারই করুণাময়ী জননী—তিনি বিমাতা নন—তাহার পায়ে ব্যথা লাগিবার ভয়ে তিনি আপন বুক পাতিয়া দিতে পারিতেন, হাসিমুখে অবহেলায়! নিজের ছেলেকে ত সকল মা ভালোবাসেন, কিন্তু পরের ছেলেকে এমন নিজের মত ভালোবাসিতে আর কোন্ মা পারেন? এই মাকে সে কিনা বিমাতা বলিয়া গালি দিয়াছে! হয়ত সে কথা শাণিত অস্ত্রের মত তাঁহার বুকে বিঁধিয়াছিল, হয়ত সে আঘাত সহিতে না-পারিয়াই তিনি আজ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন!

ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে জয়ন্ত বলিয়া উঠিল, "ভজা, আমার জন্যেই মা গেলেন, আমি মাতৃহন্তা রে, মাতৃহন্তা!"—বলিয়া, সে নিজের কপালে সজোরে করাঘাত করিল।

ভজহরি সাশ্রুচোখে জয়ন্তের হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "একন আর ও-সব কতা ভেবে মন খারাপ করিস্ নে রে, মায়্তে কেউ কারুকে পারে না—ভাই, কপাল ছাড়া পথ নেই!"

জয়ন্ত উদাস ভাবে দেয়ালের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি বলিল, "থোকন্, একন যে দেশে যেতে হবে ভাই, কখন্ গাড়ী আচে জানিস্?"

—"দেশে ফিরতে মন আর সরুচে না ভজা! কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কে আর আমাকে আগ্-বাড়িয়ে নিয়ে যাবে?"

—"তা বললে ত চল্‌বে না ভাই! মা-ঠাকরুণের শ্রাদ্দ যে একনো হয়-নি, গৌরী-দিদি ছেলেমানুষ—সে যে সেখানে একলাটি চোকের জলে বুক ভাসাচ্চে, তাকে দেক্‌বে কে, তার ভার যে একন তোর ওপরেই!"

গৌরীর মুখ মনে করিয়া জয়ন্তের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—গৌরী, গৌরী! তার সাম্‌নে গিয়া সে কেমন করিয়া কোন্ মুখে দাঁড়াইবে!…

কিন্তু যাইতেই হইবে! এ যে কর্ত্তব্য!

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দেয়ালে পিঠ রাখিয়া, অন্নপূর্ণার মুখ ভাবিতে-ভাবিতে চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

আঠারো

জগদীশপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ন্ত একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিল। ষ্টেশন হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকখানি তফাতে। অন্য-অন্য বারে অন্নপূর্ণা তাহার জন্য ষ্টেশনে বাড়ীর পাল্‌কি পাঠাইয়া দিতেন,—'গরুর গাড়ী যে বড় শক্ত, জয়ন্তের নরম গায়ে সে ব্যথা সহিবে না!'—এবারে অন্নপূর্ণা নাই—কে আর পাল্‌কি পাঠাইবে? দেশে আসিয়া অন্নপূর্ণার অভাব জয়ন্ত এই প্রথম অনুভব করিল!

মেঠো মেটে পথখানি মস্ত-বড় একটা অচৈতন্য অজগরের মত, আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূরের সবুজ বনের ভিতরে হারাইয়া গিয়াছে।—দু'-ধারে শস্যভরা ক্ষেত, সর্ব্বাঙ্গে ফিকে-হলুদী রোদ মাখিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। গরুর গাড়ীখানা আস্তে আস্তে ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া চলিতে সুরু করিল; জয়ন্ত গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল, ভজহরি পায়ের তলায় বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।……

পশ্চিমের রক্ত-সাগরে শেষ-ডুব দিবার আগে, সূর্য্য যখন ধরণীর শ্যামল মুখের পানে অন্তিম দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, গাড়ী তখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্ত ধীরে-ধীরে ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ঐ দূরে তাহাদের বাড়ী দেখা যাইতেছে! আগে-আগে জয়ন্ত যখন দেশে ফিরিত, তখন দূর হইতে এই বাড়ীখানি প্রথম চোখে পড়িলেই তাহার মনটা উল্লাসে যেন উচ্চকিত হইয়া উঠিত! আজ কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাহার প্রাণটা হু-হু করিতে লাগিল; তাহার আজন্মের স্নেহনীড়

এবং শৈশব-স্মৃতির মহাতীর্থ ঐ বাড়ীখানি আগে যেন জীবনে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল—আর আজ সে মৃত্যুর মত স্তব্ধ, শ্মশানের মত নিরানন্দ !

গাড়ী ক্রমে বাড়ীর কাছে আসিল। হঠাৎ জয়ন্ত দেখিল, বাড়ীর একটা জান্‌লায় পটের ছবির মত একটি স্থির মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া, তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। জয়ন্ত চিনিল, সে গৌরী !

ধীরে-ধীরে তাহার মুখ বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল,—গভীর লজ্জায় তাহার দেহ-মন কেমন-যেন্ এলাইয়া আসিল।

বাড়ীর সুমুখে আসিয়া গরুর গাড়ী থামিল।

চোখ তুলিয়া জয়ন্ত দেখিল, জান্‌লা হইতে গৌরী কখন্ সরিয়া গিয়াছে।

চারিদিক নীরব শোকে ভরা; কোথাও দাস-দাসী লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই,—দেউড়ীতে দল পাকাইয়া দারোয়ানেরা বসিয়া থাকিত, আজ তাহাদেরও কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। বাড়ীর উপরের-নীচের বেশীর ভাগ জান্‌লা-দরজাই খোলা নাই,—বৃহৎ সদর দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ ;—হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এ দরজা যেন কতকাল ধরিয়া এম্‌নিই বন্ধ আছে !

এই অস্বাভাবিক নির্জ্জনতার ও জীবন-হীনতার মাঝখানে, বাড়ীখানাকে দেখাইতেছে ঠিক যেন পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীর মত !

ভজহরি সবিস্ময়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

জয়ন্ত সদর দরজায় করাঘাত করিল—একবার, দুইবার, তিনবার। সে শব্দ চারিদিকের একান্ত স্তব্ধতার নিরবচ্ছিন্ন সুর ছিঁড়িয়া দিল,—কিন্তু দরজাও খুলিল না, কারুর সাড়াও মিলিল না।

পাশের আম-কাঁটালের বাগান হইতে একটা ঘুঘু সুধু শেষ বেলার

করুণ-বিলাপের স্বরে দু'-একবার ডাকিয়া, আবার যেন কি ভয় পাইয়া থামিয়া পড়িল।

ভজহরি বদ্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার! এরা কেউ বাড়ী নেই নাকি?"

—"আমি পথ থেকে দেখেছি ওপরে গৌরী দাঁড়িয়েছিল।"

—"তবে?"

—"কিছুই ত বুঝ্‌ছি না।"

এমন সময় বাড়ীর ওদিক্‌কার বাগানের পথে খক্‌-খক্‌ কাশি ও ঠক্‌-ঠক্‌ লাঠির শব্দ উঠিল।

—"এই যে! পের্‌ণাম হই দেওয়ান-মশাই, পের্‌ণাম হই!"

কালীশঙ্কর ধীরে-ধীরে আগাইয়া আসিলেন। বিষণ্ণমুখে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, "জয়, আর কি দেখতে এলে ভাই, সব শেষ হ'য়ে গেছে!"

জয়ন্ত সজল-নয়নে কালীশঙ্করের দিকে চাহিল। বুকের মাঝে মা-হারানোর ব্যথা নূতন-করিয়া আবার উথলিয়া উঠিতেছিল, কোনক্রমে আবেগ সাম্‌লাইয়া সে বলিল, "কালি-দাদা, আমাকে একটা খবরও দিতে নেই—যাবার আগে মাকে একবার প্রাণ-ভরে' শেষ-দেখা দেখে নিতুম!"

—"কি কর্‌ব ভাই, কে জানে এত-হঠাৎ এমন হবে—দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে! জানই ত, অনেকদিন থেকেই মা'র বুকের ব্যারাম ছিল, সেই অসুখই শেষটা তাঁর কাল হ'ল।......আর, খবর দিতে বল্‌ছ, কিন্তু—" বলিতে-বলিতে কালীশঙ্কর থামিয়া পড়িয়া, অধোবদনে খক্‌-খক্‌ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—"থাম্‌লে কেন কালি-দাদা, কি বল্‌ছিলে বল না!"

—"বলব? শুনলে তুমি কষ্ট পাবে কিন্তু না বলেও ত উপায় নেই ভাই!"

কালীশঙ্করের ধরণ-ধারণ দেখিয়া জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কালি-দাদা, আমার কাছে তুমি অত কিন্তু হোচ্চ কেন?"

—"তোমাকে খবর দিয়ে ডেকে আনলে মা রাগ কর্‌তেন। মরবার আগে গৌরী-দিদিকে তিনি হুকুম দিয়ে গেছেন, 'যার জন্যে আমার সত্য-ভঙ্গ হয়েছে, এ বাড়ীতে সে যেন আর কখনো ঢুক্‌তে না পায়'!—" লজ্জা-সঙ্কোচে অস্পষ্ট স্বরে, কালীশঙ্কর তাড়াতাড়ি কথাগুলো কোন-রকমে বলিয়া ফেলিলেন এবং এই কঠিন ও অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়া মাটির দিকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়ন্তের মুখের উপরে তাহার অন্তর্গূঢ় ব্যথা-বেদনার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুব নীচু গলায় সে বলিল, "তাই বুঝি দরজা বন্ধ?"

কালীশঙ্কর কোন জবাব দিতে পারিলেন না,—স্বুধু অপ্রতিভ ভাবে খক্-খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন!

—"তাহ'লে গৌরী আমাকে এ বাড়ীতে আর ঢুক্‌তে দেবে না?"

কালীশঙ্কর হতাশমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ভজহরি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটিল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কী, আমার খোকন তার নিজের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পাবে না।"

কালীশঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এ বাড়ী মা গৌরী-দিদিকে দান করে' গেছেন ভজহরি।"

ভজহরির চোখে একটা দুরন্ত ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুম্‌কী দিয়া বলিল, "কী!

কি বল্‌লেন? তাহ'লে খোকন তার বিষয় থেকে সত্যি-সত্যিই বঞ্চিত হয়েচে?"

তাহার সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া, দুই পা পিছু হটিয়া কালীশঙ্কর বলিলেন, "না, না, বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ জয়ন্তর!"

—"না, কখনি না—মা-ঠাক্‌রোণ ত তেমন লোক ছিলেন না—এ-সব চক্রান্ত, আমার খোকনকে ঠকাবার ফিকির!"

—"জয়কে কে ঠকাচ্ছে ভজহরি? আমি, না, গৌরী-দিদি?"—বলিয়া কালীশঙ্কর একটু ম্লান হাস্য করিলেন।

মাথানাড়া দিয়া মাথার ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁক্‌ড়া চুলগুলোকে এদিকে-ওদিকে দোলাইয়া ভজহরি বলিল, "ও-সব কতা আমি জানি না, জান্‌তে চাইও না!"

—"জয়ের ওপরে আমার কি দরদ নেই ভজহরি? আমি যে ওকে কোলে-পিঠে করেছি!"

—"কৈ আর দরদ আচে! ব্যাচারা মা হারিয়ে এতখানি পথ না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে ছুটে এল, আর তোমরা কিনা ওকে ধুলো-পায়েই ভিকিরীর মত তাড়িয়ে দিতে চাও? দরদ থাক্‌লে এমন কতা মুখে আন্‌তে পার্‌তে!"

—"কি করব ভজহরি, এযে মা'র হুকুম!"

—"মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়—নইলে মা-ঠাক্‌রোণ কখনো এমন হুকুম দিতে পার্‌তেন না। তাঁকে কি আমি জানি না? খোকন যে তাঁর বুকের নিধি ছিল গো!"

কালীশঙ্কর নিরুত্তর হইয়া কাশিতে লাগিলেন।

ভজহরি কাঁধের গাম্‌ছা কোমরে বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিল, "খোকনকে নিয়ে আমি এ বাড়ীতে ঢুক্‌বই,—তোমরা কে আমাকে রুক্‌তে পার,

দেখি! ভজা বুড়ো হ'লেও একনো লাটি ধরে দাঁড়াতে পারে—আর এই হাতে সে অমন দু'দশ-শো লোকের মাতা পাকা বেলের মত ফটাফট্ ফাটিয়েচে"—বলিয়া আপনার মাংসপেশী-ভরা হাত-দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সাম্‌নের দিকে বাড়াইয়া দিল!

কালীশঙ্কর অসহায়ের মত ভজহরির সুমুখ থেকে সরিয়া জয়ন্তের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন—ভজহরির এমন ভয়ানক চেহারা তিনি আর-কখনো দেখেন নাই।

জয়ন্ত এতক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অস্তমান সূর্য্যের দিকে অর্দ্ধমুদিত দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। ভজহরির চীৎকারে মুখ ফিরাইয়া ব্যথাভরা শান্ত স্বরে বলিল, "ভজা, চল্, ফের গাড়ীতে গিয়ে উঠি চল্!"

—"সে কি খোকন, তাকি হয়! কিচ্ছু ভাবিস্-নে, বাড়ীতে আমারা ঢুক্‌বই—কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না!"

—"না রে ভজা, না! মা যে আমার ওপরে অভিমান করে' হুকুম দিয়ে গেছেন;—তাঁর এ শেষ হুকুম কি আমি ঠেল্‌তে পারি? নে, চল্!"

—"না খোকন!"

রুষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে জয়ন্ত বলিল, "ভজা!"

ভজহরি তার খোকনের তীব্র দৃষ্টির সাম্‌নে একেবারে জড়োসাড়ো হইয়া পড়িল; আর দ্বিতীয় কথাটি না-কহিয়া কেঁচোর মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া সে আবার গাড়ীর উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত ফিরিয়া সহজ স্বরে বলিল, "কালি-দাদা, তবে আসি ভাই! গৌরীকে বোলো তার ওপরে আমি একটুও রাগ করি-নি। তোমরা রইলে, দেখো, তার যেন কষ্ট না-হয়!"

কালীশঙ্করের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। জয়ন্তের একখানা হাত আপনার বুকের উপরে টানিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবরুদ্ধ স্বরে তিনি

বলিলেন, "জয়, জয়, আমাকে যেন দোষী কোরো না ভাই! আমি তোমাদের খেয়েই মানুষ,—কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝ্‌ছ ত?"

—"কালি-দাদা, আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি কারুর ওপরে রাগ করিনি—রাগ কর্‌বার অধিকার আমার নেই—এ আমার কপালের দোষ! তবে, মনে এই বড় খেদ রয়ে গেল যে, মা'র শেষ কাজটাও আমি নিজের হাতে কর্‌তে পার্‌লুম না।"—আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলিয়া জয়ন্ত ধীরে-ধীরে আবার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

কালীশঙ্কর লাঠির উপরে ভর্ দিয়া অভিভূত প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গরুর ল্যাজ্ মলিয়া গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল। সে নিদারুণ বিদায়-দৃশ্য কালীশঙ্করের আর সহ্য হইল না—তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গলা খক্-খক্ ও লাঠি ঠক্-ঠক্ করিতে-করিতে তিনি আবার বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এবং যাইতে-যাইতে কোঁচার খুঁটে বারংবার আপনার চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জয়ন্ত তাহার শৈশবের সোনার-স্বপনে জড়ানো, বুকভরা স্নেহপ্রেমের রসে জীয়ানো সেই বাস্তুভিটার দিকে, নিষ্পলক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মৌন মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—জন্মের মত, জন্মের মত!

গাড়ী যখন খানিক তফাতে গিয়া পড়িয়াছে, জয়ন্তের আবার মনে হইল, গৌরীর ঘরের জান্‌লায় যেন একটি শ্বেত-বসনা মূর্ত্তি ছবির মত তেম্‌নি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে জয়ন্ত এবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল না,—কিন্তু তাহার বেদনাভরা ব্যর্থবাসনার সজলদৃষ্টি যেন আপনার প্রাণের মাঝখানে অনুভব করিল।

তাহার বাড়ীখানি দেখিতে-দেখিতে ক্রমেই স্পষ্টতর সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে

অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ঠিক পথের বাঁকের উপরে অন্ধকারের নীড়ের মত একটা মস্ত বাঁশঝাড়, আলোকহীন নিষ্প্রভ আকাশের দিকে তাহার শত-শত কঙ্কালসার হাতগুলো বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ী মোড় ফিরিতেই জয়ন্তের বসতবাড়ীখানা তাহার আড়ালে হারাইয়া গেল।

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভজহরির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ভজহরি ধরা-ধরা গলায় বলিল, "একি কর্‌লি খোকন! নিজের ভিটে ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে পরের মত কোতায় চল্‌লি ?"

জয়ন্ত চোখ মুদিয়া শ্রান্ত স্বরে বলিল, "এ মায়ের আদেশ, এর ওপরে আর কথা কোস্‌-নে ভজা !"

চতুর্থীর ভাঙা-চাঁদ যখন মুখ রাঙা করিয়া বনের কালো-কালো পাতার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে, গাড়ীখানা তখন একটা তেমাথায় আসিয়া পড়িল।

জয়ন্ত হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ভজা, এ পথে শ্মশানে যাওয়া যায়, না ?"

বসিয়া-বসিয়া ভজহরি ঢুলিতেছিল,—জয়ন্তের স্বরে সচমকে মুখ তুলিয়া চোখ কচ্‌লাইয়া বলিল, "অ্যাঁ,—কি বল্‌চিস্‌ ?"

—"ঐটে ত শ্মশানের পথ ?"

—"হুঁ।"

জয়ন্ত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া পড়িয়া বলিল, "ভজা, তোরা এইখানে একটু দাঁড়া—আমি এখনি আস্‌ছি।"

দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া ভজহরি বলিল, "সে কি রে! তুই কোতা যাবি ?"

—"শ্মশানে।"

ভজহরি আঁকুপাঁকু করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই রাত্তিরে,এই অন্ধকারে শ্মশানে? এ্যাঁ—বলিস্ কিরে, ক্ষেপ্‌লি নাকি?"

—"না, ভজা, আমি যাবই! এ পৃথিবীতে মা যেখানে জন্মের মত শেষ শোয়া শুয়েছেন, দেশ থেকে বিদায় হবার আগে সে ঠাঁইটা একবার চোখেও দেখে যাই।" জয়ন্ত হন্‌হন্ করিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

ভজহরি তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া ও একগাছা লাঠি লইয়া জয়ন্তের পিছনে পিছনে উঠিতে-পড়িতে ছুটিল।

নদীর ধারে থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যে অস্ফুট চন্দ্রালোকে বড় বড় অশথ্-বটের তলায়, খানিক কালো খানিক আলো মাখিয়া উঁচু-নীচু ঢিপি-ভরা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো শ্মশানক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে গাছের মাথায়-মাথায় ধাক্কা মারিয়া,অশরীরি প্রেতের মত অশান্ত বাতাস গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিতেছে, আর বটের দীর্ঘ ঝোলা-ঝোলা জটগুলো যেন কাহাদের শীর্ণ অঙ্গুলির মত বাঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো চেরা গলায় অশ্রান্ত স্বরে ডাকিতেছে আর ডাকিতেছে,—সে-যেন প্রেতলোকের নরক-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ।

ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, ভয়ে-ভয়ে সে বলিল, "রাম, রাম, রাম!"

গভীর নিশীথে মড়াদের এই হাড়ের বিছানায় হঠাৎ জ্যান্ত মানুষের পদক্ষেপে কাদের যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল—কারা যেন আশ-পাশ আনাচ-কানাচ হইতে দুদ্দুড় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল—সেই শব্দে ভজহরি অত্যন্ত আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিল।

—"ভজা, ও কিছু নয় রে, আমাদের দেখে শেয়ালগুলো পালিয়ে গেল!"

ভজহরির গলায় একটা ঘড়্ঘড়্ শব্দ উঠিল মাত্র—সে কোন জবাব দিতে পারিল না।

—"ভজা, আলোটা একটু তুলে ধর্!"

ভজহরি কাঁপিতে-কাঁপিতে লণ্ঠনটা কোনমতে মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল।

সেই আলোতে এদিক-ওদিক চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল, কাছেই একটা সদ্য-জ্বালানো ভস্মভরা চিতা! এইখানেই অন্নপূর্ণার নশ্বর দেহ শেষ অগ্নিশয্যায় শয়ন করিয়াছিল।

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে সেই নির্ব্বাপিত চিতার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। চিতার ভস্মরাশির মধ্যে তখনো টুক্রো-টুক্রো কতগুলো হাড় দেখা যাইতেছে—তাহার সেই স্নেহময়ী করুণারূপিণী জননীর কোমল ফুলের মত দেহের ইহাই শেষ চিহ্ন!

জয়ন্ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, ওমা! ইহলোকে আমার ওপরে অভিমান করে' তুমি চলে গেলে, পরলোক থেকে এখন আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর!" এই বলিয়া চিতার মধ্যে বিহ্বল পাগলের মত উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল—অজস্র অশ্রুজলে শ্মশানশয়নের অস্থি-ভস্ম সিক্ত করিয়া তুলিল।

ভজহরির চোখ একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। সমস্ত ভয়-ভাবনা ভুলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তকে চিতা হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "ষাঠ্, ষাঠ্! চিলুতে শুয়ে এমন সোনার দেহের অকল্যেণ করা! তুই যদি এমন করিস্ খোকন, আমি তাহ'লে মাথা খুঁড়ে মর্ব! চল্, এই রাত্তিরেই এখন নদীতে চল্, শ্মশান ছুঁলে নাইতে হয়!"

উনিশ

কলিকাতায় ফিরিয়া জয়ন্ত শুনিল, জগৎবাবু ইন্দুকে লইয়া দেওঘরে চলিয়া গিয়াছেন !

তাহার মাতৃশোকের উপরে এ আঘাত বড় নিদারুণ বাজিল। জগৎবাবু চলিয়া গিয়াছেন ! সে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেও পারিল না !

না-বলিয়া মা গেলেন, গৌরীও আশ্রয় দিল না, দেশে তাহার ঠাঁই নাই—এ-হেন দুঃসময়ে জয়ন্ত যাহার কাছ হইতে একটুখানি শান্তির প্রত্যাশা করিতেছিল, তাহাকেও দেখিতে না-পাইয়া তাহার উদাসী প্রাণমন একেবারে হ্যাতাইয়া পড়িল।

ইন্দুর উপরে তাহার রাগ হইল, ঘৃণা হইল, অভিমান হইল !—যাহার জন্যে সে আজ সর্ব্বস্বহারা, সেও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না ! একদিনের মিথ্যা কলঙ্কে এতদিনের ভালোবাসা যে ভুলিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে কখনো ভালোবাসে নাই ;—ইন্দুর প্রেম কপট প্রেম—এ প্রেমে প্রাণপণে নির্ভর করা তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে ; পরকে সে আপন করিতে ত পারিলই না—মাঝখান থেকে শুধু আপনজনকেই পর করিল !

আজ কয়দিন ধরিয়া জয়ন্তের হৃদয় এম্‌নি-সব কথা ভাবিয়া রাগে-দুঃখে-অভিমানে তোল্‌পাড় হইয়া উঠিতেছে আর দিনে দশবার সে এই-বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে, ইন্দুকে সে ভুলিবে, ভুলিবে—ইন্দুকে সে ভুলিবেই !........ জয়ন্ত একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে, ইন্দু হয়ত

এখনো তাহাকে ভালোবাসে, ইন্দু হয়ত তাহার পিতার ইচ্ছাতেই দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছে!

বাস্তবিক, প্রেম এম্‌নি পল্‌কা, একটুকুতেই এম্‌নি ঝাঁকিয়া পড়ে,—প্রেমিকের মনোজগতে এম্‌নি "ক্ষণেকে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ!"

আজ সকালে জয়ন্ত যখন অস্কার ওয়াইল্ডের কাব্যরসের ভিতরে আপনার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিহিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল, তখন ভজহরি আসিয়া দরদ-ভরা কণ্ঠে বলিল, "আহা, পথে একটা ভিকিরী পড়ে আচে দেকে এলুম, তার ওপরে 'মা'র কৃপা' হয়েচে খোকন!"

বই হইতে চোখ তুলিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বসন্ত হয়েছে! কোথায়?"

—"এই আমাদের বাঁসার দু'চারখানা বাড়ীর পরেই! ব্যাচারী একজনদের রোয়াকে উঠে শুয়েছিল, তা তারা তাকে সেকান থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে! সে এখন পথে পড়ে'-পড়ে' চেঁচিয়ে কেঁদে মর্‌চে—দেকে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু দুঃখু করে' কি আর কর্‌ব বল্‌ খোকন—এ-সবই গ্যালোজম্মের কম্মফল! কার কপালে কি আচে, কে বল্‌তে পারে—হরি হে, তোমার মহিমে বোজা ভার!"—বলিয়া ভজহরি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হরির উদ্দেশে একটি দৃশ্যমান প্রণাম প্রেরণ করিল।

জয়ন্ত বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিতে-দিতে বলিল, "ভজা, আমার সঙ্গে আয়!"

—"কোতায় খোকন?"

—"আয়, দু'জনে মিলে ধরাধরি করে' সে বেচারীকে একখানা গাড়ীতে তুলে হাঁস্‌পাতালে দিয়ে আসি!"

ভজহরির মুখ শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া গেল। হাঁউমাউ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই তাকে ছুঁবি কিরে!"

—"চোখের সাম্‌নে একটা মানুষ পথের ওপরে পড়ে ছট্‌ফটিয়ে মর্‌বে, আর আমরা হাত গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাই দেখ্‌ব? মানুষ হয়ে মানুষকে সাহায্য কর্‌ব না! ছিঃ ভজা, তোর মুখেও এমন কথা শুন্‌তে হোলো!"

ভজহরি বোকা বনিয়া লজ্জিত মুখে মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে জয়ন্তের পিছনে-পিছনে চলিল,—সে খোকনকে বুঝাইতে পারিল না—তাহার আসল ভয় ও ব্যথা কোন্‌খানে!

* * * * *

এই ঘটনার দু'দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত বাসায় ফিরিয়া বলিল, "ভজা, আমার জ্বর হয়েছে, গলায় আর কোমরে ভারি ব্যথা!"

সেই রোগী ভিখারীকে ছোঁয়া-ঘাঁটার পর হইতেই ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল,—জয়ন্তের জ্বর ও গায়ে ব্যথা হইয়াছে শুনিয়াই তাহার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল!

তাড়াতাড়ি জয়ন্তের কপালে হাত রাখিয়া সে বলিল, "তাইত রে, তোর গা যে আগুন!"

জয়ন্তকে ধরিয়া তখনি সে বিছানায় শুয়াইয়া দিল। ঘরের সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করিয়া রোগীর শিয়রে আসিয়া বসিল! কাতর স্বরে বলিল, "খোকন, তকুনি মানা করেছিলুম, গোঁয়ারতুমি করে' ভিকিরীটাকে ক্যানো ছুঁলি বল্‌ দেকি!"

জয়ন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এতদিন ধরে নিজের স্বার্থে-ই প্রাণকে খাটিয়ে দেখলুম ত, কিন্তু কি কর্‌তে পার্‌লুম ভজা! আর আজ

একদিন পরের উপকারে প্রাণকে খাটাতে গিয়ে যদি নিজের প্রাণের ভয় করি, তবে তেমন দুর্ব্বল প্রাণে দরকার কি বল্ ত ?”

ভজহরি মহা চটিয়া বলিল, “অত আর বক্-বক্ কর্‌তে হবে না, চুপ-চাপ শুয়ে থাক্। ক্যাতাব পড়ে তোর জ্ঞান হয়েচে না ঘোড়ার ডিম হয়েচে—হয়েচিস্ খালি কতার ভট্‌চায্!”

জয়ন্ত সেই স্নেহের ভর্ৎসনায় একটুখানি হাসিয়া পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল।

ভজহরি তাহার কপালে কয়েকটি পয়সা ছুঁয়াইয়া দেবতার কাছে মানত্ করিয়া তুলিয়া রাখিল।

শেষ রাত্রে জয়ন্তের জ্বর আরো বাড়িয়া উঠিল—জ্বরের ঘোরে সে যা তা ভুল বকিতে সুরু করিল।

ভয়ে ভাবনায় আকুল হইয়া ভজহরি সারা রাত ঠায় জাগিয়া বসিয়া রহিল এবং দুই হাত যোড় করিয়া উর্দ্ধনেত্রে বারংবার বলিতে লাগিল, “ঠাকুর, তুমি প্রাণ চাও ত আমার প্রাণ নাও, আমি মরি তায় ক্ষেতি নেই, খোকন আমার সেরে উঠুক্।”

কুড়ি

সকাল বেলায় অবনী সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়াছে, অমনি বাহির হইতে হেঁড়ে গলায় ডাক্ আসিল, "অবনী, বাড়ী আছ হে ?"

—"কে, স্বর্ণ নাকি ? আরে এস, এস, বাড়ীর ভেতরে এস।"

মিনিট-খানিক পরেই স্বর্ণেন্দু জুতো মস্-মস্ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

অবনী চাকরকে আর-এক পেয়ালা চা আনিতে হুকুম দিয়া স্বর্ণেন্দুকে বলিল, "হাঁহে, এ ক'-দিন ভোজবাজির মত হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে বল ত ? একেবারে এ-মুখো হও-নি বড় যে ?"

স্বর্ণেন্দু একসঙ্গে চোখ-মুখ-নাক কুঁচ্কাইয়া কহিল, "আরে রাম রাম, সে কথা আর বল কেন ? তোমাদের ঐ জয়ন্ত ছোঁড়াটা যে শুক্নো বাঁশের মত এমন নীরস, তা কি ছাই আগে জান্তুম ? সে শাসিয়ে এসেছে, আমাকে ধর্তে পার্লে দেখে নেবে—অর্থাৎ, আমাকে যত-খুসি ঘুষি-চড় মার্তে একটুও কসুর কর্বে না ! জানই ত, গায়ের জোরের জন্যে আমি কখনই বিখ্যাত নই—মুষ্টি-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা কর্তে হ'লে অদৃশ্য হওয়া ছাড়া আমার পক্ষে গতিরন্যথা ! তাই এ-পাড়ায় আসিনে আর ! এতদিনে বোধহয় তার রাগ পড়ে গেছে—কি বল ?"

অবনীর চোখদু'টোর ভাব এমনধারা হইয়া গেল, যে, তার সঙ্গে অনায়াসে খুব বড়-বড় ছানাবড়ার তুলনা করা যাইতে পারে ! আশ্চর্য্য স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"জয়ন্ত তোমাকে মার্বে বলেছে ! কেন হে ?"

—"সে কথা পরে হবে-অখন, আগে ওদিক্কার, অর্থাৎ জগৎবাবুর

খবর কি বল দেখি শুনি! জয়ন্ত এখনো সেখানে যাওয়া-আসা করে নাকি?"

—"হঠাৎ তুমি এটা জান্‌তে চাইছ কেন?"

—"কারণ আছে, বল না।"

—"দেখ স্বর্ণ, ব্যাপারটা যে কি, স্পষ্ট সব শুনি-নি—তলিয়েও বুঝি-নি। তবে জগৎবাবু একদিন ভয়ানক ক্ষাপ্পা হয়ে একঘর লোকের সুমুখেই জয়ন্তকে যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। তাঁর কথাবার্ত্তার ধরণে বুঝলুম, জয়ন্তের চরিত্র নাকি ভালো নয়।" এই বলিয়া অবনী সেদিনকার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপরে পা-দু'টো তুলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু দু'-পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে লাগিল। তাহার তন্ময় মুখ দেখিয়া বোধ হয়, জয়ন্তের দুর্দ্দশার কাহিনীটা তাহার কাণে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত মধুবৃষ্টি করিতেছে!

অবনী চায়ের পেয়ালাটি শেষ-চুমুকে নিঃশেষ করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, রুমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেদিন জয়ন্তের মুখ দেখে আমার ভাই প্রথমটা একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তুমি ত জানই, আমি সকলকেই ক্ষমা কর্‌তে পারি—কেবল চরিত্রহীনকে নয়। জয়ন্ত যে ভেতরে-ভেতরে এমন ডুবে-ডুবে জল খায় তা আমি কখনো কল্পনাও করি-নি।"

ঠোঁট টিপিয়া একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "দুর্নীতি দুর্নীতি করে' আঁৎকে ওঠা, তোমার চিরকেলে পাগ্‌লামী। ঐ-জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার সব-জায়গায় বনে না!"

অবনী বিরক্ত স্বরে বলিল, "না-বনে না বন্‌বে। ওটা আমার পাগ্‌লামী নয়—ওটা আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌।"

"যাক্, বাজে তর্ক নিয়ে থাম্‌কা মাথা গরম কর্‌তে চাই না।"

"হ্যাঁ, তাই ভালো। তোমার মত্ আমার মত্ দু'টি সরল রেখার মত; যতই টানাটানি কর্‌বে ততই বেড়ে যাবে, কিন্তু মিল্‌বে না কিছুতেই।"

—"তাহ'লে ও-অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করে' লাভ নেই। আচ্ছা, জয়ন্ত সেদিন নিজের পক্ষ-সমর্থন করে' কিছু বলে-নি ?"

—"বল্‌লে, সে নির্দ্দোষ। আরো কি সব বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু জগৎবাবু তাকে আর-কিছু বল্‌তে অবকাশ দিলেন না।"

—"তবে আর কি, তোমার ইন্দুলেখা লাভের পথ এবারে নিষ্কণ্টক হ'ল!"

অবনী একটুও আনন্দের ভাব না দেখাইয়া, কেমন হতাশ স্বরে বলিল,—"কিছুমাত্র হয় নি! ইন্দুলেখার মন খারাপ বলে জগৎবাবু তাকে নিয়ে দেওঘরে চলে গেছেন। যাবার আগে আমি আর-একবার বিবাহের কথা তুলেছিলুম, কিন্তু জগৎবাবু স্পষ্টই জবাব দিলেন, ইন্দুলেখা আমাকে পছন্দ করে না। দেখ দেখি স্বর্ণ, আমাকে ইন্দু'র পছন্দ হোলো না—তার পছন্দ হোলো কিনা ঐ দুশ্চরিত্র জয়ন্তকে! স্ত্রীলোকের মর্ম্ম বোঝা ভার!"

স্বর্ণেন্দু টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলিয়া লইয়া তার পিছনদিক দিয়া কাণ খুঁটিতে-খুঁটিতে, পরম আরামে চোখদু'টি স্তিমিত করিয়া বলিল, "তাহ'লে জয়ন্তের সঙ্গে ইন্দুলেখার বিবাহ না-হ'লেও তোমার আশা-ভর্‌সা একেবারে ফর্‌সা ?"

—"কাজেই। আমি আর ও-কথা নিয়ে মিছে ভেবে মর্‌তে প্রস্তুত নই। যা অসম্ভব—তা অসম্ভব।"

—"তা যদি হয়, তবে আমার আর কোন হাত নেই। জয়ন্ত

তোমার পথের কাঁটা হয়েছিল, আমি অনেক ফন্দি এঁটে তাকে সরিয়ে দিলুম। কিন্তু ফন্দি এঁটে তোমার ইন্দুর মন-ফেরানো ত আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বে না!—স্ত্রীলোকের প্রেম হচ্ছে দামোদরের বন্যার মত ;—বুঝেছ অবনী, সে একবার বাঁধ ভাঙ্‌লে সুপথ-কুপথ কিছুই বাছে না—যেদিকে চলেছে সেদিক থেকে আর কোনমতেই ফেরে না! আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে জয়ন্তকে আমি বিদায় করেছি বটে, কিন্তু ইন্দু'র মন থেকে সে এখনো বিদায় হয়-নি!"

বোকার মত হাঁ-করিয়া স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, অবনী বিস্মিত স্বরে বলিল, "কী পাগলের মত বক্‌ছ!"

"অর্থাৎ, আমিই কৌশল করে' জগৎবাবুকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছি যে, জয়ন্ত লোকটা বাইরে সাধু, কিন্তু ভিতরে ভণ্ড!"

চেয়ারখানা টানিয়া স্বর্ণেন্দুর কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া অবনী কৌতুহলের সহিত বলিল, "আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি!"

স্বর্ণেন্দু খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, "তুমি যে-রকম নীতিবাগীশ, তাতে সব কথা তোমাকে খুলে বল্‌তে আমার ভরসা হচ্ছে না। উল্টে হয়ত শেষটা আমাকেই দুষে বস্‌বে!"

অবনী বুঝিল, জয়ন্তের বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু কি-একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। বর্দ্ধিত কৌতুহলে সে বলিল, "স্বর্ণ, তোমার এ লুকোচুরি আমার ভালো লাগছে না ভাই। স্পষ্ট করে' সব খুলে বল।"

বলিবার জন্য স্বর্ণেন্দুরও পেট ফাঁপিয়া উঠিতেছিল ; আসল কথা ঢাকিয়া রাখিলে সে যে কতবড় একজন সেয়ানা বুদ্ধিমন্ত লোক সেটাও যে ঢাকা থাকিয়া যায়! অতএব সে আর-কোন ইতস্তত না-করিয়া সেদিনকার সমস্ত ঘটনা গড়্‌গড়্ করিয়া বলিয়া গেল।

অবনীর মুখ শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া সে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া, স্তম্ভিতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, "স্বর্ণ, এ কাজটা গর্হিত হয়েছে। এতে তোমার বুদ্ধির চেয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশী করে' পাওয়া যাচ্ছে! কেননা, তুমি কি ভাব্‌ছ জয়ন্ত এতবড় মিথ্যে অপবাদটা মুখ বুজে মাথা পেতে নেবে? সে যখন তোমার নাম করে আসল ব্যাপারটা জগৎবাবুর কাছে খুলে বল্‌বে,—তখন?"

—"স্পষ্টই বল্‌ব, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। এমন-কি হুস্‌না-বাইকেও যদি ডাকিয়ে আনাতে হয়, তাও আমি আনাব। তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। বাইজী এসে সাফ্‌ বল্‌বে, জয়ন্ত হামেসাই তার বাড়ীতে গিয়ে মদটদ খায়, গান-বাজ্‌না শোনে। আরো বল্‌বে, সে আমাকে কখনো চক্ষেও দেখে-নি।"

অবনী একেবারে থ হইয়া গেল। তারপর চোখ পাকাইয়া বলিল, "উঃ, এমন ভয়ানক মিথ্যাকথা সাজাতে তোমার বুক একটুও কাঁপ্‌বে না?"

স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মিথ্যাকে তোমরা যতটা ভয়ানক বলে কল্পনা কর, মিথ্যার আসল রূপ ততটা ভয়ানক নয়! সত্য ত পঙ্গু, দুর্ব্বল,—জগতে মিথ্যার মত কার্য্যকর আর কি আছে?"

স্বর্ণেন্দুর একখানা হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া অবনী ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "থামো, থামো! তোমার এ সয়তানী দার্শনিকতার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। জয়ন্তকে আমরা ভালো না-বাস্‌লেও অকারণে তার ওপরে এমন অপবাদ দেওয়াতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। যদি আসল ব্যাপারটা কোনগতিকে জাহির হয়ে যায়, তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে। তখন সমাজে আমি যে আর মুখ দেখাতে পারব না।"

স্বর্ণেন্দু ব্যাজার হইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "এইজন্যেই তোমাকে ত আমি কিছু বল্‌তে চাইছিলুম না। জয়ন্ত আমাদের কি-রকম ঘৃণা আর তুচ্ছ তাচ্ছল্য করত, সে-সব এরি-মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?"

অবনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জয়ন্ত হয়ত তোমাকেই ঘৃণা কর্‌ত। আমার সঙ্গে তার মতে মিল্‌ত না,—এই পর্য্যন্ত।"

স্বর্ণেন্দু ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর ইন্দুলেখাকে বিবাহ করে' সে তোমার মুখের গ্রাস যে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, সেটাও বুঝি কিছু নয়? অবনী, তোমার সেদিনকার রাগ আমি এখনো ভুলি-নি, বুঝ্‌লে?"

—"এইটুকুর জন্যে একজন সৎলোককে মিথ্যে কথা কয়ে অসৎ বলে প্রতিপন্ন কর্‌তে হবে! তোমার মত আমি এখনো ততটা পাষণ্ড হ'তে পারি-নি!"

—"সৎ আর অসৎ একটা কথার কথা! যারা সৎ, তারা কখনো অসৎ হবার অবকাশ পায়-নি বলেই সৎ!"

—"যাই বল আর যাই কর, এ-ব্যাপারে আমি নেই। পিছল পথে চলে শেষটা যদি আছাড় খাই, তখন আমাকে তুল্‌বে কে?......উঁহুঃ, এ ব্যাপারে আমি নেই!"

—"তা না থাকো, না থাক্‌বে! কিন্তু তোমার মুখটা অন্তত বন্ধ রেখ।"

—"যখন সব শুনেছি তখন আমি মুখও বন্ধ রাখ্‌তে পারব না। শেষটা তোমার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়ি, আর জয়ন্ত-বেচারীর ঘাড়ে যে কলঙ্কের বোঝা চেপেছে সেইটে আমার ঘাড়েই এসে চাপুক্ আর কি! না স্বর্ণ, সে-সব হচ্ছে না—"

বিষম রাগে স্বর্ণেন্দুর কটা মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—চোখদু'টো ভাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। ঠোঁট্ কামড়াইয়া টেবিলের উপরে দুম্-

করিয়া একটা ঘুসি মারিয়া সে চ্যাঁচাইয়া বলিল, "তুমি এমন কাপুরুষ ? ধিক্ !"

অবনী তাহার রাগ দেখিয়া ভ্রুক্ষেপও করিল না ; দৃঢ়স্বরে বলিল, "দুর্নীতি আর দুর্নামের সুমুখে আমি চিরকালই এম্‌নি কাপুরুষ থাক্‌ব ! ইন্দুলেখার সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ হয়, তুমি সেইজন্যে সাহায্য কর্‌বে বলে ভরসা দিয়েছিলে ! এরই নাম তোমার সাহায্য করা ? কী ভয়ানক ! তোমার মত বন্ধুর হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন !"

স্বর্ণেন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর !"

—"স্বর্ণ, তুমি যদি চুরি করেই থাক, সে আমার জন্যে কর-নি ! তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি, জয়ন্তের ওপরে তোমার রাগ আছে বলেই তুমি এ-কার্য্য করেছ ! যাক্—এইবেলা কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতা থেকে মানে-মানে সরে পড় ! আমি সব কথা শীঘ্রই প্রকাশ করে' দেব —নইলে আমাকে গুরুতর পাপে পাপী হ'তে হবে !"

একুশ

ঠিক তেলে-বেগুনের মত জ্বলিয়া স্বর্ণেন্দু যখন চলিয়া গেল, অবনী বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল ঃ—

'তাইত বলি, জয়ন্তের মত লোক কখনো অমন কুস্থানে যেতে পারে ? সে মাঝে-মাঝে যে-সব গান গায়, সেগুলোর কোন-কোনটা নীতির দিক্ দিয়ে খুব ভালো হয় না বটে, কিন্তু তাতে-এতে যে ঢের তফাৎ!……সেদিন তার অপমানে আমি যে সত্যি-সত্যিই খুব-বেশী দুঃখিত হয়েছিলুম, তা নয় ; কিন্তু আজ তার কথা ভেবে আমার প্রাণটা কেমন কাতর হয়ে উঠ্ছে!……স্বর্ণেন্দু আমারি বন্ধু ; জয়ন্ত হয়ত মনে-মনে ঠাউরেছে, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে তাকে সরাবার ফিকিরে বন্ধুর সাহায্যে আমিই এই ষড়যন্ত্রটা পাকিয়ে তুলেছি! সে কখনো চুপ করে' থাক্‌বে না, জগৎবাবুকে একদিন-না-একদিন সব কথা খুলে বল্‌বেই! জগৎবাবুও নিশ্চয় আমাকেই সন্দেহ কর্‌বেন!……তাইত, আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যাহোক,—এখন উপায় ? যদি আমি আগে-থাক্‌তেই জগৎবাবুর কাছে সমস্ত প্রকাশ করে' না দি, তাহ'লে শেষটা দেখ্‌ছি আমাকেই এই কুৎসিত অপযশের ভাগী হ'তে হবে!……

'জগৎবাবুর বাড়ীতে জয়ন্তের মান বাড়ুক্ বা কমুক্, তাতে আমার সুবিধে-অসুবিধে কি ? ইন্দুলেখাকে আমি ত অ্যাম্‌নেও পাব না, অম্‌নেও পাব না—সে ত আমাকে চায় না! জানি না, আমার ওপরে ইন্দুর এই বিষদৃষ্টি কেন ?………বেশ দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় পালকের চেয়ে হাল্‌কা হচ্ছে, ধুলো ; ধুলোর চেয়ে হাল্‌কা, বাতাস ; বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, নারী ; আর নারীর চেয়ে হাল্‌কা কি ?—কিছু না!'

অবনী বসিয়া-বসিয়া এম্‌নি নানান কথা ভাবিতেছে—হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাবু ঘরে আছেন,—বাবু ?"

অবনী সাড়া দিতে-না-দিতেই ভজহরি ঝোড়ো কাকের মতন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

অবনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি জয়ন্তবাবুর চাকর না ?"

ভজহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ! আমার খোকনকে বাঁচান!"

—"কে ?"

—"আমাদের খোকন গো, আমাদের বাবু!"

—"জয়ন্তবাবু ? কেন, তাঁর কি হয়েছে!"

—"জ্বর হয়েচে—কাল শেষ-রাত থেকে ভুল বক্‌চে!"

—"জ্বর হয়েচে ত অত ভাব্‌না কিসের ?"

—"কে জানে এ কী জ্বর! বল্‌লুম ভিকিরীটাকে ছুঁস্‌নে—তা সে ত শুন্‌লে না!"

—"তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নি! ভিখিরীর কথা আবার কি বল্‌ছ ?"

ভজহরি তখন হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কখনো বুক চাপ্‌ড়াইয়া, কখনো কপালে করাঘাত করিয়া কোনরকমে সব কথা খুলিয়া বলিল।

অবনীর তখন মনে পড়িল, সেদিন বাড়ী আসিবার সময়ে সেও জয়ন্তের বাড়ীর কাছে একটা বসন্ত-রোগী ভিখারীকে রাস্তায় পড়িয়া-পড়িয়া কাত্‌রাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু আর-পাঁচজনের মত সেও ভয়ে তাহার কাছে না-ঘেঁষিয়াই চট্‌পট্‌ চলিয়া আসিয়াছিল।......জয়ন্ত নিশ্চয় সেই ভিখারীটাকেই পথ হইতে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে!......এইখানে জয়ন্তের নির্ভীক উদারতার সঙ্গে আপনার

ভীরু-অক্ষমতার কথা ভাবিয়া অবনী মনে-মনে লজ্জিত হইল। জয়ন্তকে ভালোবাসিত না বলিয়া সে তাহার ভিতরকার সাঁচ্চা মনটিকে এতদিন দেখিতে পায় নাই; আজ জয়ন্তের আসল পরিচয় পাইয়া অবনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার চোখের উপর হইতে যেন-একটা অন্ধকারের ঠুলি আচম্বিতে খসিয়া পড়িল!

ভজহরি ব্যাকুলভাবে বলিল, "খোকনের পেচনে শনি নেগেচে গো! আজ ক'-দিন হোলো সে তার মাকে হারিয়েচে—"

—"জয়ন্তবাবুর মা মারা গেছেন!"

—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তার ওপরে এই ব্যাপার! তার একন আপন বল্‌তে আর কেউ নেই! তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম—আপনি খোকনের বন্ধু, এ-পাড়ায় আর কার কাচে যাব বলুন বাবু? আমি মুক্যু-সুক্যু মানুষ, কোতায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, কি কর্‌তে হয় কিছুই জানি-না যে! আর দেরি কর্‌বেন না,—তাকে আমি অ্যাকলা ফেলে এসেচি!"

জয়ন্তের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া অবনীর প্রাণটা কেমন আপনা-আপনি ভিজিয়া আসিল! যদিও জয়ন্ত তাহার বন্ধু নয়, তবু এমন অসময়ে তাহাকে সাহায্য করা যে শত্রু-মিত্র সকলেরই কর্ত্তব্য, এটা বুঝিয়া অবনী বলিল, "আচ্ছা, তুমি তোমার বাবুর কাছে যাও—আমি একেবারে ডাক্তার নিয়ে পরে যাচ্ছি।"

ভজহরি ধড়ে যেন কতকটা প্রাণ পাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

... ...

... ...

ডাক্তার জয়ন্তকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীর গায়ে বোধহয়

বসন্ত ফুটিবে। এত-বেশী জ্বর, ভুল-বকা, গলায় ও কোমরে ব্যথা, এ-সব বসন্তেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

অবনী ভারি ভাবনায় পড়িয়া গেল। যদি জয়ন্তের কিছু হয়, তবে সে দায়িত্ব কে ঘাড়ে করিয়া লইবে?

ভজহরিকে ডাকিয়া সে বলিল, "ভজহরি, তোমার বাবুর বাড়ীতে কি এমন কেউ নেই, যিনি এখানে এসে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌তে পারেন?"

—"হ্যাঁ, গৌরীদিদি আচে।"

—"তিনি তোমার বাবুর কে?"

—"খোকনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কতা ছিল। গৌরীদিদি খোকনদের বাড়ীতেই মানুষ হয়েচে গো বাবু!"

—"জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আর-কারুর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বুঝি? কৈ, তা ত জান্‌তুম না!"

ভজহরি খুব সংক্ষেপে জয়ন্তের বাড়ীর কথা বলিল। জয়ন্ত যে দেশে গিয়া পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিল না। যাহাকে একবার আপন মনে করিত, তাহার কাছে কিছুই ঢাকিয়া রাখিতে পারিত না,—এটা ছিল ভজহরির মস্ত দুর্ব্বলতা! অবনী যে এই অসময়ে তাহার খোকনকে দেখিতেছে-শুনিতেছে, তাইতেই ভজহরি একেবারে গলিয়া গিয়া তাহাকে পরম আপনজন বলিয়া ধরিয়া লইল!

ভিতরে-ভিতরে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অবনী তা জানিত না। জয়ন্তের অসহায়তা তাহার চোখে আরো করুণ হইয়া জাগিয়া উঠিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা বলিল, "ভজহরি, তাহ'লে তোমার দেশে খবর পাঠালে কেউ কি আস্‌বে না?"

ভজহরি হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

অবনী বলিল, "আচ্ছা, তবু খবর ত পাঠানো যাক্, তারপর যা-হয় দেখা যাবে। তোমাদের বাসার সাম্‌নের জগৎবাবুকে জান ত?"

—"জানি বৈকি! এই বিপদের সময়ে তিনিও যদি একানে থাকৃতেন বাবু, তাহ'লে অনেকটা সুরাহা হ'ত।"

—"হ্যাঁ। তাঁকেও একটা খবর দি। তিনি এলেও আস্‌তে পারেন।"

অবনী তখনি টেলিগ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

বাইশ

জ্বরের মাঝখানে জয়ন্তের হঠাৎ একটু সাড় হইল।

সে তাহার কপালের উপরে কাহার দু'খানি পদ্মের মতন নরম করপুটের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিল। এ হাত ত ভজহরির নয়!...... জয়ন্ত চোখ মেলিতে গেল, পারিল না। তাহার চোখে ভারি বেদনা।

তাহার সারা দেহেও তখন গরম সূঁচের মত কি-যেন পট্-পট্ করিয়া বিঁধিতেছে আর বিঁধিতেছে,—সে যন্ত্রণা অসহ্য! জয়ন্ত ক্ষীণ কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, ইন্দু?"

ভজহরি পাশেই বসিয়াছিল; সে বলিয়া উঠিল, "অ আমার পোড়া-কপাল! তোমার ইন্দু কোতায়—ওযে গৌরীদিদি! জগৎবাবুকে তার করা হয়েছিল, তা তিনি বলে পাঠিয়েচেন, একন আস্‌তে পার্‌বেন না! কিন্তু গৌরীদিদি খপর পেয়েই ছুটে এয়েচে! আপন লোক না-হ'লে কি দরদ হয়,—কি বলেন দেওয়ান-মশাই!"

জয়ন্তের কাণে কালীশঙ্করের খক্-খক্ কাশির আওয়াজ গেল। বিস্মিত অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "গৌরী—গৌরী! গৌরী এসেছে—" বলিতে বলিতে সে আবার নীরব হইয়া পড়িল।

গৌরী জয়ন্তের মাথার উপরে দু'খানি থর্‌থরে হাত রাখিয়া চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

জয়ন্তের সমস্ত দেহে তখন ভীষণ রোগের মারাত্মক-চিহ্ন দেখা দিয়াছে,—সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে ভজহরি বলিল, "আমার খোকনের যদি কিছু হয়, তাহ'লে আমি আত্মঘাতী হব। হে মা শেতলা—"

গৌরী দুই ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া ভজহরিকে চুপ করিতে বলিল।

ভজহরি খানিকক্ষণ জয়ন্তের দিকে তাকাইয়া কোন-রকমে মুখ বন্ধ করিয়া রহিল ; তারপর আবার বলিল, "আচ্ছা দেওয়ান-মশাই, ডাক্তার-সায়েব কি সত্যিসত্যিই বলে গেলেন যে, খোকনের চোখের ভেতরেও মা'র অনুগ্র হয়েচে ? না, এ মিচে কতা—না ?"

গৌরী তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কী সব কথা বল্‌ছ ভজহরি ! যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও !"

ভজহরি কাঁচুমাচু মুখে হাত যোড় করিয়া বলিল, "এবারটা আমায় মাপ কর দিদি !"

—"আচ্ছা, ফের্ কথা কইলে তুমি এখানে আর থাক্‌তে পাবে না !"

ভজহরি দুই হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজিয়া, লুকাইয়া-লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সারা দিন গেল। বিছানার উপরে কলাপাতে শুইয়া জয়ন্ত সমস্ত ক্ষণটা খালি ছট্‌ফট্-ছট্‌ফট্ করিয়াছে—এ-পাশ ও-পাশ ফিরিয়া, চিৎ হইয়া, উপুড় হইয়া, কোন-রকমে কিছুতেই সে একটুও স্বোয়াস্তি পাইতেছে না—তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছে যে যেন হাজার-হাজার ধারালো বর্ষার উপরে শুইয়া আছে ! ঠোঁটে ঠোঁট্ চাপিয়া সে এই মর্ম্মভেদী যাতনা চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না—তাহার দেহের শত-শত ক্ষতের মুখ দিয়া ভিতরের হাহাকার যেন বাহিরে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

বিকৃত মুখে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার সে বলিয়া উঠিতেছে, "আর পারি না, মলে যে বাঁচি—এর-চেয়ে মরা ভালো গো, মরা ভালো !"

কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ভজহরির চোখ যেন কাণা হইয়া গেল—বৃদ্ধের জীর্ণ চক্ষের মধ্যে এত অশ্রুও ছিল !

গৌরী কিন্তু পাষাণ-প্রতিমার মত অটল হইয়াই আছে। তার

প্রাণের ভিতরকার কথা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু বাহিরে তাহার চোখের প্রান্তে এতটুকু অশ্রু, তাহার প্রশান্ত-মুখে এতটুকু অশান্তির লক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না! রোগীর ঔষধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা—যখন যেটির দরকার,—কলের কাঁটার মত গৌরী তা করিয়া যাইতেছে—একটি কথাও না-কহিয়া!

সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত কতক-চেতন কতক-অচেতনের মত শুইয়া ছিল; হঠাৎ সে জড়িত স্বরে আস্তে-আস্তে যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ইন্দু,— ইন্দু, তুমি এলে না—তুমি আমাকে এমন করে' দাগা দিলে!" জয়ন্তের মুদিত চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রোগের এই নরক-যাতনার মধ্যেও ইন্দুর স্মৃতি জয়ন্ত ভুলিতে পারে নাই! গৌরীর প্রাণের কোন্ কোণে যে গভীর ব্যথা তুষানলের মত প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, জয়ন্তের এই কথায় তাহা যেন জ্বল্‌জ্বলে হইয়া উঠিল! —পাছে ভজহরি তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া বলিল, "আলোটা বড় বাড়িয়ে দিয়েছ ভজহরি, ওটা কমিয়ে দিয়ে আসি!" ·········কিন্তু আলোর শিখা না-কমাইয়া গৌরী যে আরো-বেশী বাড়াইয়া ফেলিল, দুঃখ-কাতর ভজহরি অতটা খেয়াল করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে অবনী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। গৌরীকে দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল—গৌরীও লজ্জিত হইয়া ভিতর হইতে সরিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভজহরি, তোমার বাবু এখন কেমন আছেন?"

তাহার স্বর বোধ হয় জয়ন্তের কাণে গেল—সে চম্‌কাইয়া উঠিল। সেটা অবনীর চোখ এড়াইল না।

তেইশ

জগৎবাবু ভাবিয়াছিলেন, দেওঘরে আসিলে ইন্দুলেখা জয়ন্তের অভাব শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছেন, ইন্দুলেখা যেমন ছিল তেমনটি আর হইল না—বরং দিন-কে-দিন যেন আরো-বেশী মন-মরা হইয়া পড়িতেছে।

ইন্দু এখন সকল সময়েই অন্যমনস্ক থাকে, ঘরের ভিতর হইতে সহজে বাহিরে আসিতে চায় না, অকারণে চটিয়া চাকর-বাকরদের ধমক দেয়। আর এই ইন্দুই দু'দিন আগে ছিল বিদ্যুতের মত চঞ্চল, তার হাসির কলরোল ছিল ঝরণার মত অবিরল! এখন তাহার চোখের কোলে কালির দাগ ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতেছে, তাহার কপোলের উপর হইতে গোলাপী অভাটুকু ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার নধর দেহখানি ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কী যে করিবেন, জগৎবাবু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, দিন-কে-দিন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন বল্ ত!"

ইন্দু লোক-দেখানো শুকনো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌চ, তোমার চশ্‌মার নম্বর বদ্‌লানোর দরকার হয়েচে।"

—"তোর কি এখানটা ভালো লাগ্‌চে না?"

—"খুব ভালো লাগ্‌চে।"

—"তবে?"

—"তবে—কি, বাবা?"

—"তবে তুই অমন মন্-মরা হয়ে থাকিস্ কেন ?"

—"বাবা, তুমি খালি খালি ভারি এক-কথা কও,—আর আমি তোমার কথার জবাব দেব না !"

ইন্দু'র কপালের উপরকার এলমেল কতকগুলো চুল গোছাইয়া দিতে-দিতে জগৎবাবু বলিলেন, "মা ইন্দু, আমার কাছে লুকোস্-নে সত্যি করে' বল্ দেখি বাছা, তুই কি এখনো জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌তে চাস্ ?"

ইন্দু চলিয়া যাইতে-যাইতে নির্ব্বাক ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিয়া গেল, না।

তারপরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া, অকারণে অত্যন্ত জোরে দুম্-করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল !

... ...

এর-মধ্যে জগৎবাবু হঠাৎ একদিন অবনীর কাছ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন :—"জয়ন্তের অত্যন্ত জ্বর ; বসন্ত হবার সম্ভাবনা ; আপনি কল্‌কাতায় এলে ভালো হয় ; রোগীকে দেখ্‌বার লোক নেই।"

টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎবাবুর মন প্রথমটা একটু নরম হইয়াছিল—কারণ, জয়ন্তকে তিনি সত্যসত্যই স্নেহ করিতেন, ভালো বাসিতেন। কিন্তু তারপরেই তাঁহার মনে পড়িল জয়ন্তের চরিত্রের কথা ! বুঝিলেন, এখন কলিকাতায় গেলে চলিবে না। জয়ন্তের সঙ্গে তিনি যখন কিছুতেই ইন্দু'র বিবাহ দিতে পারিবেন না, তখন এ-দু'জনের মধ্যে যাহাতে আর-না দেখাসাক্ষাৎ হয়, এখন তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য—তিনি পিতা, আগে তাঁহাকে আপন মেয়ের শুভাশুভ দেখিতে হইবে ত।......আর, জয়ন্ত, এখনো তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে কেন ? সে ধনীর ছেলে, দেশে তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে,—ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া যাক্ না !

তিনি পর, তাঁহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন? সে কি ভাবিয়াছে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? না, অসম্ভব!

সুতরাং উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম করিলেন—"জয়ন্ত দেশে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাক্; এখন আমার যাওয়া চল্‌বে না।"

অবনীর টেলিগ্রামখানি জগৎবাবু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; পাছে ইন্দু'র মন চঞ্চল হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু বলিলেন না।

জগৎবাবু এত সন্তর্পণে আট-ঘাট বাঁধিয়া চলিয়াও ইন্দুর মনকে কিছুতেই ভালো করিতে পারিলেন না। অবশেষে, এমন চমৎকার জল-হাওয়াতেও ইন্দুর রোজ ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর হইতে লাগিল। এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া জগৎবাবু বিদেশ-বাসের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্দু হঠাৎ গোঁ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল, সে কোনমতেই কলিকাতায় যাইবে না।

ইন্দু তাঁহার মেয়ে, তাঁহার কোলেই সে মানুষ, তাহার চরিত্রের সমস্তই তিনি বুঝিতেন; তবু আজ তাঁহার কাছে এই তরুণী মেয়ের মনটি একটা বিষম হেঁয়ালির মত খাপ্‌ছাড়া ঠেকিল।

আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন, "কল্‌কাতায় যাবি-নি কি রে?"

ইন্দু দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি এখানেই থাক্‌ব!"

—"এখানকার জল-হাওয়া তোর সহ্য হচ্ছে না!"

—"এখানকার জল-হাওয়া যদি আমার সহ্য না-হয়, তবে কল্‌কাতার ধুলো আর ধোঁয়া আরো-অসহ্য হবে!"

—"কিন্তু—"

—"যতই 'কিন্তু' বল আর যতই ঘাড় নাড়ো বাবা, আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়্‌ব না, কিছুতেই না! দেখ দেখি—" এই বলিয়া ইন্দু ঘরের জান্‌লাটা খুলিয়া দিল। তারপর বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া

বলিল, "দেখ দেখি বাবা, এখানে কেমন নীল আকাশ, কেমন ছবির মতন পাহাড়, কেমন খোলা মাঠ, সবুজ বন, ঢেউ-খেলানো নদী! এ দেখ্‌লে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! এ-সব ছেড়ে কল্‌কাতায় আমি যেতে চাই না। আস্‌বার সময়ে তুমি আমাকে জোর করে' নিয়ে এসেছ, এখন যাবার সময়ে তুমি যতই জোর কর, তবু আমি যাচ্ছি না বাবা!" —এই বলিয়া ইন্দু খুব হাসিতে লাগিল।

ইন্দুর হাসি দেখিয়া জগৎবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু জগৎবাবু যেই অদৃশ্য হইলেন, ইন্দুর মুখের ভাব অম্‌নি ধীরে-ধীরে বদ্‌লাইয়া গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উদাস ভাবে বিছানায় গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে নিপুণ অভিনেত্রীর মত পিতাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এখন বাহিরের অভিনয়ে আপনার ভিতরের মনকে সে কিছুতেই বোঝ মানাইতে পারিল না!

এইভাবে আরো-কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সেদিন দুপুরে কি-একটা কারণে জগৎবাবু যখন প্রিয়ভৃত্য মাণিক-চাঁদকে উচ্চৈঃস্বরে ধমক্ দিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং মাণিক যখন সে ধমক্ একটুও আমোলে না-আনিয়া হাতের আড়ালে নীরবে হাস্য করিতেছে, তখন ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল।

জগৎবাবু ধমক্‌টা আপাতত বন্ধ রাখিয়া পত্রখানা খুলিলেন। পত্রখানা অবনীর। সে লিখিয়াছে:—

"শ্রদ্ধাস্পদ জগৎবাবু,

জয়ন্তের অসুখের জন্য এত ব্যস্ত ছিলুম যে, আপনাদের কোন খবর নিতে পারি-নি। সেজন্যে কিছু মনে কর্‌বেন না।

আমার টেলিগ্রামের আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা-থেকে বুঝেছি এখনো আপনি জয়ন্তের উপরে বিরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই চিঠিখানি পড়্লেই বুঝ্বেন যে, জয়ন্তের উপরে রাগ করে' তার প্রতি আপনি কতটা নিষ্ঠুর অবিচার করেছেন!

আপনি জানেন না, জয়ন্ত কী হতভাগ্য! আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর ক্রমাগত দুঃখ-শোকের আঘাতে সে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তাঁর মা মারা গেছেন, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ থেকে,—সে আপনার কন্যাকে ভালোবেসে বঞ্চিত হয়েছে, দেশের ভদ্রাসনে তার আর মাথা রাখ্বার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু এত নির্য্যাতনের পরেও সে শান্তি পেলে না—আরো-এক ভীষণ দুঃখ এসে তাকে জীবন্মৃত করে' দিয়ে গেছে। রাস্তার বসন্তরোগে মৃতপ্রায় একটা ভিখারীকে বাঁচাতে গিয়ে, সে আপনিই ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল—এ-যাত্রায় কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ-জীবনে পৃথিবীকে সে আর দেখ্তে পাবে না,—তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে!"

এই-পর্য্যন্ত পড়িয়াই জগৎবাবু আঁৎকাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার হাত হইতে খসিয়া চিঠিখানা মাটির উপরে [illegible]গিয়া পড়িল। আপনা-আপনি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! অন্ধ?..... জয়ন্ত অন্ধ?"—তাঁহার বুকটা শিহরিয়া উঠিল!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত মনে তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং পত্রখানা মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন:—

"আপনাকে আর-একটি বিশেষ সংবাদ দিচ্ছি। আপনি সেদিন —[illegible] জয়ন্তকে যে অপমান করেছিলেন, সেটা আপনার পক্ষে

সুবিচার হয়-নি ; কারণ, সে নির্দ্দোষ। একজন ভালো গায়কের গান শুনিয়ে আন্‌বে, এই অছিলায় ভুলিয়ে জয়ন্তকে, আমাদেরই স্বর্ণেন্দু কুস্থানে নিয়ে যায়। জয়ন্ত সরল মনেই স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে গিয়েছিল,—সে যে কোন গায়িকার বাড়ীতে যাচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও এমন সন্দেহ কর্‌তে পারে নি। তারপর যখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারে তখন সুবিধা পাবামাত্রই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসে। জয়ন্তের উপর স্বর্ণেন্দু অত্যন্ত চটা ; তাইতেই সে এ-হেন ষড়যন্ত্র করে' মনের ঝাল ঝেড়েছে। আমি আসল সত্যটা জান্‌তে পেরেছি স্বর্ণেন্দুর নিজের মুখ থেকেই ; সুতরাং জয়ন্ত যে নিরপরাধ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেক সময়ে চাক্ষুষ প্রমাণও যে যথেষ্ট প্রমাণ নয়, এ-থেকে আপনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাবেন।

"এত দুঃখ-শোক অপমান-নির্য্যাতনেও, ভীষণ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও জয়ন্ত আপনার কন্যাকে ভুল্‌তে পারে-নি—এমন-কি, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বক্‌তে-বক্‌তেও সে খালি 'ইন্দু ইন্দু' করে' কাত্‌রে উঠেছে! তার প্রেম যে এত গভীর, আমি তা জান্‌তুম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনার টেলিগ্রামের উত্তর তার কাণে গিয়েছে। বিছানায় পড়ে রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে-কর্‌তেও সে বারংবার বলেছে, "আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনেও ইন্দু এল না!" আপনার উত্তরটা বোধহয় অসুখের চেয়েও নিদারুণ হয়ে তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে।

জগৎবাবু, আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি তা বিবেচনা করুন। আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়। নমস্কার। ইতি—

স্নেহপ্রার্থী

অবনী।"

পত্রপাঠ যখন সাঙ্গ হইল, জগৎবাবুর বুকের স্পন্দন তখন যেন থামিয়া

গেল! পাষাণীভূতের মত নিশ্চল হইয়া বহুক্ষণ তিনি বসিয়া রহিলেন; —তারপর রুদ্ধ যন্ত্রণার আবেগে দুই হাতে কপালের দু'-পাশ চাপিয়া ধরিয়া সাম্‌নের টেবিলের উপরে মাথা রাখিলেন—তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি এমন ভাবে আর-কখনো আহত হয় নাই! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জয়ন্তের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তিনিই দায়ী—একমাত্র তিনিই দায়ী! কোনমতেই আত্মসংবরণ করিতে না-পারিয়া শেষকালে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,—আমি নরাধম—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—সুধু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

পাশের ঘরে জান্‌লার ধারে বসিয়া ইন্দু তখন উদাস চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া অবধি, তাহার দুঃখ-দীর্ণ চিত্তের কাছে এখন সুধু একমাত্র সান্ত্বনা, ধরণীর এই শ্যামল মুখ।......খানিক দূরে দু'ধারের আকের আর অড়রের ক্ষেতের মাঝখানে, শুক্‌নো নদীর শাদা বালির বাঁকা রেখাটি যেন নিঝুম দুপুরের ভরা-রোদে গা-এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মাঝে মাঝে পায়ের তলায় চলন্ত ছায়া ফেলিয়া, চাষার মেয়েরা বালি খুঁড়িয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে; তীরের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া কতক গুলো গরু, মোষ ও ভেড়া চরিতেছে; কোথাও-বা উঁচু-নিচু পাথরের ঢিপির উপরে দু'-চার্‌টে বক ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে—যেন ছবিতে আঁকা। অনেক দূরে আকাশ-পৃথিবীর সীমারেখা আড়াল করিয়া, পাষাণে-পরিণত মস্ত-একটা স্থির-মেঘের মত কালো পাহাড় ছম্‌ড়ি খাইয়া আছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আলোক-ছায়ার বিচিত্র পরিবর্ত্তন!......এম্‌নি-সব নানান দৃশ্যের মাঝে ইন্দুর দৃষ্টি লক্ষ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এমন সময় হঠাৎ তার কাণে পিতার অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর আসিয়া ঢুকিল। সচমকে, বিস্মিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল—"বাবা, তুমি কি বল্‌ছ?"

যাতনায় অস্বাভাবিক কণ্ঠে জগৎবাবু ডাকিলেন, "ইন্দু—ইন্দু!"

ইন্দু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পিতার মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল!

জগৎবাবু টেবিলের উপরে পত্রখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন,—মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না!

পত্র পড়িতে-পড়িতে ইন্দুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল—তারপর চিঠি-পড়া শেষ-হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে মাটির উপরে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িল।.........

জগৎবাবু তাহাকে যখন কোলে করিয়া তুলিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন, ইন্দু তখন অনেকটা সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছে।

আস্তে-আস্তে বিছানা হইতে নামিয়া, সে ক্ষুব্ধ—তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "বাবা!"

জগৎবাবু মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—"বাবা, অবনীবাবুর টেলিগ্রামের কথা ত তুমি আমাকে বল-নি।"

জগৎবাবু আজ তাঁহার নিজের মেয়ের সুমুখেই দোষীর মত মাথা হেঁট করিলেন।

—"বুঝেছি বাবা, পাছে আমার ভাব্‌না বাড়ে, সেই ভয়েই টেলিগ্রামখানা তুমি আমাকে দেখাও-নি! কিন্তু আজ্‌কের চেয়েও কি সেদিনকার ভাব্‌না বেশী গুরুতর হ'ত বাবা? এখন যে চিরজীবন ভাব্‌তে হবে!"

জগৎবাবু নিরুত্তর।

—"নাও বাবা, জিনিষপত্তর্ সব বাঁধ্‌তে হুকুম দাও,—আমরা আজ্‌কেই কল্‌কাতায় ফির্‌ব!"

চব্বিশ

—"গৌরী!"

—"বল।"

—"তুমি কি এখনো বসে আছ?"

—"আছি।"

—"না, আর তোমাকে জেগে থাকতে হবে না গৌরী! আমি ভালো আছি। যমের মুখ থেকে যে খসে পড়েছে, তার জন্যে আর ভয় কি?"

—"অমন কথা বোলোনা গো, আমার বড় কষ্ট হয়।"

—"যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কষ্ট দেওয়াই আমার স্বভাব। দেখ্‌চ-না, মাকে এত কষ্ট দিলুম যে, তিনি এ পৃথিবীতে কিছুতেই আর টিক্‌তে পারলেন না! আজ মা ত নেই, খালি তুমি আছ। এখন তোমাকে কষ্ট দেব-না ত আর কাকে দেব বল?"

—"তুমি ঘুমোও গো, ঘুমোও! দেখ্‌ছ না, রাত যে অনেক হ'ল।"

—"রাত হ'ল কি দিন হ'ল সে খোঁজ তারা রাখুক্—দিন-রাত যাদের জন্যে! জাননা, অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন?"—

—জয়ন্ত পাগলের মত কঠোর হাস্য করিল। সে হাস্য গৌরীর বুকের হাড়গুলোর উপরে ধাক্কা মারিয়া যেন বজ্রের মত ধ্বনিয়া উঠিল! দু'-হাতে ভর দিয়া আস্তে-আস্তে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া জয়ন্ত ঊর্দ্ধমুখে বলিল, "গৌরী, পৃথিবীতে কি এখনো চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, আলো জাগে? এখনো কি আকাশ তেম্‌নি নীল, গাছ তেম্‌নি সবুজ,

ফুল তেম্‌নি রাঙা? আমার কাছে কিন্তু সব মুছে গেছে—একেবারে, একেবারে! আমার মনের ভিতরে যে মস্ত জগৎ ধূ-ধূ কর্‌ছে, সেখানে আর চাঁদ হাসে না, সূর্য্য ওঠে না, রং ফোটে না—সেখানে এখন সুধু একজন বাসিন্দা আছে, দিন-রাত সে সুধু অবিরাম স্তব্ধতার ধ্যান কর্‌ছে—তার নাম, অন্ধকার! তাকে তোমরা জান—কিন্তু আমার মত স্পষ্ট করে' তাকে তোমরা কেউ দেখ-নি, কেউ দেখ-নি!"—জয়ন্তের স্বরে কী গভীর ক্রন্দনের সুর!

গৌরী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থামো!"

জয়ন্ত আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল। প্রাণের আবেগ তাহার দেহ ভাঙিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিল, "গৌরী, মা'র অভিশাপে আজ আমি এমন হতভাগ্য।"

—"মা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন! এমন কথা মুখেও এন না!"

—"দেখ্‌ছ, আমার কি পাপ মন! নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আবার মাকে দুষ্‌ছি! তাঁর অভিমানকে অভিশাপ মনে কর্‌ছি! বাইরের চোখের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের চোখও অন্ধ হ'ল নাকি?"

গৌরী নিসাড় হইয়া রহিল। জয়ন্তও নীরবে আনমনে কি ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে এখন আর কেউ আছে?"

—"না।"

—"আচ্ছা, তাহ'লে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।...... তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাসো?"

গৌরী স্তব্ধ।...অন্ধ জয়ন্ত দেখিতে পাইল না গৌরী কেমন

করিয়া তাহার মুখের পানে নির্ণিমেষে চাহিয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি কী মমতাভরা !

—"এই অন্ধ, রোগের ক্ষতে কুৎসিত, অকৃতজ্ঞ জয়ন্তকে এখন এ-তুনিয়ায় কেউ ভালোবাস্‌বে না গৌরী, কেউ ভালোবাস্‌বে না। বোধহয়, তুমিও না।"

গৌরী জোর-করিয়া কথা কহিল। ব্যথাভরা-স্বরে বলিল, "অন্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা কর্‌ব……আমি ?"

জয়ন্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ! তুই হাতের তুই মুঠোর মধ্যে বিছানার চাদর চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "তাহ'লে তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো ! বেস না গৌরী, আমায় ভালো বেস না ! তোমার ভালোবাসা আমি তোমাকে কি-করে' ফিরিয়ে দেব ? আমি ত তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ব না ! তোমাকে স্নেহ কর্‌তে পারি বোনের মত—কিন্তু আমার প্রাণে তুমি আর-কিছু খুঁজে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমি কপটতা কর্‌তে চাই না। এ মন যাকে সমস্ত সমর্পণ কর্‌তে চেয়েছিল, অসময়ে সে আমাকে ত্যাগ করেছে। তাকে যেমন ভালোবেসেছিলুম, তেমন ভালোবাসা আর ত আমি তোমাকে দিতে পার্‌ব না ! গৌরী, আমার এ নিষ্ঠুর সত্যকথায় তুমি রাগ কোরো না ! বল, এ-কথার পরেও তুমি কি আমাকে ত্যাগ কর্‌বে না ?"

কোনক্রমে কান্না চাপিয়া লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গৌরী বলিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর—কিন্তু আমি সুধু তোমার ঐ পা-তু'টি পূজো কর্‌তে চাই—সে অনুগ্রহ থেকে আমাকে আর বঞ্চিত কোরো না !"

জয়ন্তের সাম্‌নে গৌরী কখনো তাহার মনের কথা এমন-করিয়া আর বলে নাই—বলিতে পারে নাই ! প্রাণের দায়ে ভীরুও নির্ভীক হইয়া উঠে !

জয়ন্ত ধীরে-ধীরে বলিল, "গৌরী, আমি তোমার সঙ্গে যে নির্দ্দয় ব্যবহার করেছি, সে-সব ভুলে করুণাময়ী দেবীর মত তুমি আমার এই রোগশয্যার শিয়রে এসে বসে আছ—দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা ভুলে। তোমার সেবা-শুশ্রূষা না-পেলে এ-পৃথিবী থেকে নিষ্ঠুর জয়ন্তের নাম এতদিনে মুছে যেত। যে প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, সে প্রাণের উপরে এখন তোমারি অধিকার। এ অধিকার থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু ভেবে দেখ গৌরী,—আমি অন্ধ, কুৎসিত, জীবন্মৃত। আমার এ-দেহ এখন পাথরের মত, এতে আর একবিন্দুও প্রেম নেই। দুর্ব্বহ একটা বোঝার মত, তুমি কি সারাজীবন আমাকে ঘাড়ে ক'রে বইতে পার্‌বে?"—এই-বলিয়া জয়ন্ত গৌরীর একখানি হাত লইয়া আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

গৌরীর হাত জয়ন্তের মুষ্টির মধ্যে কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না।

—"গৌরী, তোমার রূপ আছে গুণ আছে অর্থ আছে। ইচ্ছে কর্‌লে তুমি রাজার রাণী হ'তে পার। তবে কেন তোমার জীবনকে ব্যর্থ কর্‌তে চাও? দেখ, এখনো ভেবে দেখ, যে ভুল তুমি কর্‌তে চাইছ—সে ভুল একবার কর্‌লে জীবনে আর শোধ্‌রাতে পার্‌বে না—"

জয়ন্তের কথায় গৌরীর দেহ কেমন-একটা বিহ্বলতার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; তাহার গোপন প্রাণের মধ্যে যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এতদিন শৈল-কন্দরে বন্দী নির্ঝর-স্রোতের মত আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছিল,—আজ যেন সে বাহিরে আসিবার রন্ধ্র খুঁজিয়া পাইল। আজ আর সে আপনাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না,—আচম্বিতে জয়ন্তের কোলের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বাসরুদ্ধ অশ্রুসিক্ত-স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো, থাক্—থাক্, আর আমাকে যন্ত্রণা

দিও না! এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি—এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর গাঢ়, কোমল-স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভেবেছিলুম আমার এ ব্যর্থ জীবনটা নির্জল, নির্জ্জন, মরুভূমির মত সংসারের বাইরে পড়ে চিরকাল হা-হা করে' মর্‌বে; কিন্তু তার মাঝখানে তুমি যখন নদীর একটি স্নিগ্ধ ধারার মত কোন নিষেধ না-মেনে বয়ে আস্‌তে চাইছ, তখন এস গৌরী, তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আর আমার নেই! দেখ, যদি এ মরু-প্রাণ তোমার প্রেমের রসে আবার একটু সরস হয়, এর জ্বলন্ত তৃষা তোমার স্পর্শে আবার যদি শান্ত হয়!"

পঁচিশ

পরের দিন সকালে জয়ন্ত বুকের উপরে দুই হাত রাখিয়া বিছানায় শুইয়া আছে—সূর্য্যের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে ;—সে স্তব্ধ হইয়া সেই আলোকের তাপ আপন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

এমন সময় ভজহরি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খোকন, ও-বাড়ীর জগৎবাবু তোমার সঙ্গে দ্যাকা কর্‌তে চাইচেন।"

জয়ন্ত ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "জগৎবাবু!"

—"হ্যাঁ, তিনি আর সেই মেয়েটি।"

জয়ন্তের মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "ইন্দু?"

"হুঁ। গাড়ী থেকে দেক্‌লুম জিনিষ-পত্তর্‌ সব নামানো হচ্চে—বোধহয় ওরা সবাই এক্ষুনি বিদেশ থেকে এল।"

চিন্তিত মুখে নীরস স্বরে জয়ন্ত বলিল, "ওঁদের ওপরে নিয়ে এস।"

একটু পরেই জগৎবাবুর পিছনে-পিছনে ইন্দু আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। জগৎবাবুর মুখ বিষণ্ণ, চোখ ছল্‌ছলে, ভাব-ভঙ্গী অপরাধীর মত সঙ্কুচিত। ইন্দুও অত্যন্ত জড়সড়—তাহার মাথাটি বুকের উপরে হেঁট হইয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত দরজার দিকে অন্ধ চোখ তুলিয়া বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

জয়ন্তের দিকে তাকাইয়াই জগৎবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

এই সেই জয়ন্ত, সেই হাস্যপ্রফুল্ল, গৌরকান্তি, পরমসুন্দর জয়ন্ত! মানুষের দেহ এত-শীঘ্র এমন বদ্‌লাইতে পারে? জগৎবাবুর পা-থেকে-মাথা-পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল!

ইন্দু বিবশ হইয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িল—একবার দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া, জয়ন্তের দিকে আর সে ভরসা করিয়া মুখ তুলিতে পারিল না!

জয়ন্ত শুষ্ক-হাসি হাসিয়া বলিল,—"চুপ করে' কি দেখ্‌ছেন জগৎবাবু? এই জ্যান্ত মড়াটাকে দেখে কি আপনাদের ভয় হচ্ছে?"

জগৎবাবুর চমক্ ভাঙিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, জয়ন্তকে একেবারে আপন বুকের ভিতরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম!"

জগৎবাবুর সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে জয়ন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।—

অনেকক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া জয়ন্ত একটু সরিয়া বসিল!

জগৎবাবু কাতর-স্বরে বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার ওপরে রাগ কোরো না বাবা, আমি এই জোড়হাতে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! তোমার নির্ম্মল চরিত্রে আমি সন্দেহ করেছিলুম—তোমাকে অপমান করে' আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—এ মহাপাপ আজ আমাকে দগ্ধে-দগ্ধে মার্‌ছে, আমার দিন-রাতকে বিষময় করে' তুলেছে—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর! ইন্দু, উঠে আয় মা, উঠে আয়—জয়ন্তের পায়ে ধরে বল্ তোর বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্‌তে!"

কিন্তু ইন্দুর তখন সাড় ছিল না—মৃত দেহের মত স্থির হইয়া, নিষ্পলক-নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া, সে তেম্‌নি ঠায় বসিয়াই রহিল।

মনের আবেগে জয়ন্ত ইন্দুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জগৎবাবুর মুখে ইন্দুর নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল! আপনার অন্ধ চক্ষুকে ঘরের চারিদিকে বুলাইয়া, অত্যন্ত অভিমানে ফুলিয়া-ফুলিয়া বলিল, "না, না, ইন্দুকে আর আস্‌তে হবে না! আপনার ভ্রম ভেঙেছে আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবে, আজ না এসে আর কিছুদিন আগে যদি আস্‌তেন, তাহ'লে রোগের যাতনার ভেতরেও হয়ত আমি শান্তি পেতুম।"

এই সময়ে অবনী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত নেত্রে সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "এই যে, আপনারা এসেছেন! আমি জানি, আপনারা আস্‌বেন!"

জগৎবাবু অবনীর দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, আপনার কাছে আমি চিরদিন কেনা হয়ে রইলুম। আপনি যদি চিঠি লিখে সমস্ত না প্রকাশ করে' দিতেন, তাহ'লে আমার বুক থেকে এক মহাপাপের বোঝা কোনদিনই হয়ত নাম্‌ত না—" থামিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, "কিন্তু আর দু'-দিন আগে যদি এ খবরটা পেতুম!"

অবনী বলিল, "তাহ'লে সত্যিই ভালো হ'ত জগৎবাবু!"

জয়ন্ত দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "অবনীবাবু আপনাকে কি খবর দিয়েছেন জগৎবাবু?"

—"অবনীবাবুর পত্রেই ত কাল আমরা জানতে পারি, তুমি নিরপরাধ! স্বর্ণেন্দুর চক্রান্তের কথা তিনি সব প্রকাশ করে' দিয়েছেন। সেই পত্র পেয়েই আমরা কল্‌কাতায় ছুটে আস্‌ছি!"

জয়ন্ত একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পর্য্যন্ত এই অবনীকে সে প্রত্যহ তাহার কাছে-কাছে ছায়ার মত লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছে এবং ভজহরির মুখে এও শুনিয়াছে যে, অবনী নিজেই ভালো-ভালো ডাক্তার আনাইয়া, তাহার দেশে খবর দিয়া যাহাতে

চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না-হয় সে-সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে। অবনী তাহার প্রতিবেশী হইলেও এর আগে তাহার বাসায় বড়-একটা আসিত না; তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব বলিয়া কোন-কিছু ছিল না। বরং সে তাহার এক রকম শত্রু ছিল বলিলেই হয়। স্বর্ণেন্দুর সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের ভিতরে অবনীরও যে যোগ ছিল, জয়ন্তের এ বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত অটল আছে। সুতরাং, অবনী যে কেন তাহার সঙ্গে হঠাৎ এতটা আত্মীয়তা করিতেছে, যাচিয়া উপকার করিতেছে, এর কোন হদিস্ না-পাইয়া জয়ন্ত মনে-মনে ভাবিত, সে বোধ হয় তাহাকে জব্দ করিবার ফিকিরে নূতন কোন্ চাল্ চালিতে চায়! তবু এ সন্দেহ সে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিত না—কারণ, অবনীর চাল্-চলনে পরের বিপদে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন মন্দ অভিসন্ধি জয়ন্ত এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই!

কিন্তু আজ জগৎবাবুর কথা শুনিয়া জয়ন্তের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। এই অবনীকে সে বিশ্বাস না-করিয়া তাহার উপকারকে অপকার বলিয়া ভাবিয়াছে বলিয়া জয়ন্ত মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কৃতজ্ঞ-স্বরে সে বলিল, "অবনীবাবু, আপনি জগৎবাবুকে চিঠি লিখে আমার যে উপকারটা কর্‌লেন, তার জন্যে—"

বাধা দিয়া অবনী বলিল, "তার জন্যে কি ভাষায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা নিয়ে আপনাকে একটুও মাথা ঘামাতে হবে না জয়ন্তবাবু! আমি যা করেছি নিজের মাথা বাঁচার জন্যেই করেছি। সত্যি কথা বল্‌তে দোষ নেই যে, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন আগে বিশেষ মধুর ছিল না! এমন অবস্থায় স্বর্ণেন্দুর দোষের জন্যে আমাকে দায়ী হ'তে হয়—কারণ, সে আমার অন্তরঙ্গ না-হ'লেও বাল্যবন্ধু, আমার সঙ্গেই সে ঘোরে-ফেরে, জগৎবাবুর বাড়ীতে যায়। আর,—ঠিক বল্‌তে

পারি না, তবে জয়ন্তবাবুর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হ'ত—তিনি যেন আমাকেই সন্দেহ কর্‌তেন!"

জয়ন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। কিন্তু সে-সব কথা আজ ভুলে যান—অসময়ে যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু পৃথিবীতে আর-কোথায় পাব?"

আনন্দে আপ্লুত হইয়া জয়ন্তের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া অবনী বলিয়া উঠিল, "তোমার ওপরে অনেক অবিচার করেছি জয়ন্ত, তার বদলে তুমি আমাকে যে বন্ধুত্ব আজ দান কর্‌লে, সে দান আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিলুম!"

এমন সময়ে ভজহরি ব্যাজার-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনারা আমার খোকনকে একটু জিরুতে দিন,—ওর দেহের দশা দেখ্‌চেন না!"

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, তোর কি এখনো বুদ্ধি হ'ল না! ভদ্রলোকদের—"

ভজহরি মুখভার করিয়া বলিল, "তুই থাম্ খোকন। ভজা বয়েসে তোর চেয়ে তিন গুণ বড়, আঁতুড়ঘরে তুই যখন ট্যাঁ করিস্‌-নি, ভজার বুদ্ধি আর মাতার চুল তকুনি পেকে উটেচে! ভজার বুদ্ধিতে চল্‌লে আজ তোর এ হাল হ'ত না। তোর অসুক্ বাড়্‌লে ভুগ্‌তে হবে ত আমাকেই!"—

অবনী হাসিয়া বলিল, "ভজহরি, তোমার কথাই ঠিক্, জয়ন্তবাবুকে এখনি এত বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।"

ভজহরি যো পাইয়া বলিল, "বলুন ত বাবু, বলুন ত! শুন্‌লি খোকন? না, অ্যাখনো বল্‌বি ভজার মত অবনীবাবুরও বুদ্ধি-সুদ্ধি কিচ্ছু নেই?"

জগৎবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ ভজহরি, জয়ন্তকে আজ আমরা আর বিরক্ত কর্‌ব না। ইন্দু, এস!"

ইন্দু এতক্ষণ তেম্‌নি নীরবে বসিয়াছিল। পিতার আহ্বানে যেন হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে জাগিয়া, ধীরে-ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করুণ-নয়নে একবার জয়ন্তের দিকে চাহিয়া বিদ্রোহী পা-দু'টোকে টানিয়া টানিয়া—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে, ইন্দু আপন ঘরে একলাটি বসিয়া-বসিয়া কত-কি যে ভাবিতেছিল!

আজ সকালে যে দৃশ্য সে দেখিয়া আসিয়াছে, সারাদিন আর তা ভুলিতে পারে নাই; জয়ন্তের সেই দু'টি দৃষ্টিশূন্য কাতর অন্ধ চক্ষু, দু'দু'টো বিষধরের মত রহিয়া-রহিয়া তাহার মর্ম্মের মাঝে দংশন করিতেছে, —আর রুদ্ধ যাতনায় তাহার প্রাণ যেন বুকের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে!·········ইন্দু ভাবিতেছিল, এর আগে সেও যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তবে এমন নিদারুণ দৃশ্য আর ত তাহাকে দেখিতে হইত না!

আরো ঢের কথা ইন্দুর মনের তটে স্রোতের মত আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সকালে জয়ন্তবাবুর বাসায় সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে মেয়েটিও মুখ বাড়াইয়া অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল—তাহার চোখে যেন পলক পড়িতেছিল না। ইন্দু তাকে চেনে না—কখনো দেখেও নাই; কিন্তু সে যে কে, তা সে তখনি বুঝিতে পারিয়াছিল। জয়ন্তবাবুর মুখে সে অনেকবার যার কথা শুনিয়াছে, এ নিশ্চয়ই সেই গৌরী!

তাহার ঘরের সাম্‌নেই রাস্তার ও-ধারে জয়ন্তের বাসা। তাহার ঘর হইতে জয়ন্তের ঘরের ছোটখাট জিনিষটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জান্‌লার পাল্লা ভেজাইয়া, খড়্‌খড়ির ফাঁকে চোখ রাখিয়া আজ সারাদিন সে বসিয়া আছে! সমস্ত দিন গৌরী জয়ন্তের শিয়রে বসিয়া জয়ন্তকে পাখার হাওয়া করিয়াছে, তাহার যখন যেটির দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়াছে।

ইন্দুর চোখের সুমুখে, তাহারি কর্ত্তব্য যেন গৌরী জোর-করিয়া কাড়িয়া লইতেছে! এ দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠিলেও সে চোখ ফিরাইয়া মনকে বুঝাইতে পারে নাই!.........জয়ন্তের উপরে তাহার রাগ হইয়াছে, গৌরীর উপরে তাহার হিংসা হইয়াছে!

তারপরেই আবার বারবার মনে পড়িয়াছে, কাহারও উপরে রাগ, অভিমান, হিংসা করিবার তাহার আর কোন অধিকারই নাই! জয়ন্তের মনে আর কি তার একটুখানিও ঠাঁই আছে? যে লোক সব ছাড়িয়া একদিন সুধু তাকেই আপন করিতে চাহিয়াছিল, জীবন-মৃত্যু যখন যুঝাযুঝি করিতেছে—সেই অসময়ে সে যে তার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকায় নাই! এ নিষ্ঠুরতার কি ক্ষমা আছে?.........

শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস একটা গানের খানিকটা তাহার ঘরের ভিতরে বহিয়া আনিল।

সেই চির-চেনা স্বর ইন্দুর ভাবনা-বিভোর চিত্তকে আচম্বিতে সচেতন করিয়া তুলিল—

" .....গেঁথেছ যে রাগিণী
একাকিনী দিনে দিনে,
আজিও যায় ব্যেপে
কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে,
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারি পরশন
হরষণ সুধাঢালা,
ফাগুন আজো যেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,

আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে ?
একদা তুমি প্রিয়ে,
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে গেছ ভুলে !
একদা তুমি প্রিয়ে………”

ইন্দুর সমস্ত দেহ যেন শ্রবণময় হইয়া উঠিল, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আবেগভরে দুই চক্ষু মুদিয়া সে শুনিতে লাগিল,

“একদা তুমি প্রিয়ে—”

কে এ প্রিয়া ?……এ কি, সে ? তাকে কি এখনো তার মনে আছে—এ প্রিয়া কি বিস্মৃত প্রিয়া নয় ?

ইন্দুর মুখের উপরে জাগ্রত ফাল্গুনের নন্দিত বাতাস উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া গেল, আর সেই স্মৃতি-জাগানো বাতাসের মোহন ছন্দের সঙ্গেই যেন তাল রাখিয়া অন্ধ জয়ন্ত গাহিতে লাগিল,

“ফাগুন আজো যেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,
আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে ?”

এ কি অভিমানীর কাতর জিজ্ঞাসা, না, ব্যর্থ-প্রেমের হতাশ তিরস্কার ? ……ইন্দু ত ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না ; স্মৃতির যে মালা সে গাঁথিয়াছে, সে যে প্রাণপণে যত্নে তাকে মর্ম্মের ভিতরে চাপিয়া আছে ! পাছে শুকাইয়া যায় সেই ভয়ে ইন্দু যে অশ্রুধারায় সে স্মৃতি-মাল্যকে স্নিগ্ধসজল করিয়া রাখিয়াছে !

ইন্দু কাঁদিতে-কাঁদিতে ব্যথিত চোখদু'টি মেলিয়া দেখিল, জয়ন্ত তার ঘরের সামনের বারান্দায়, একলাটি চাঁদের আলোতে বসিয়া আপনমনে গান গাহিতেছে।

উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিল, গৌরী তখন সেখানে নাই।

সাতাশ

সেদিন বসন্তের হাওয়ায় জয়ন্তের মন হঠাৎ-কেমন উতলা হইয়া উঠিল। গৌরী যখন তাহাকে বারান্দায় বসাইয়া গৃহস্থালীর কাজে চলিয়া গেল, তখন চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখ-চোখের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই আলোক-দূতের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়া, অভ্যাসমত সে আকাশের দিকে মুখ তুলিল—কিন্তু দেখিল সুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! তখন মনে পড়িল, তাহার এই জীবনব্যাপী নিবিড়-তিমিরে চাঁদের ছবি আর-কখনো জাগিবে না!... ...ভবিষ্যতের যে আশার সাম্রাজ্য এতদিন সে মনে-মনে গড়িয়া তুলিয়াছিল—নিয়তির একটি আঘাতে আজ তাহা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে,—কল্পনার সেই বিশাল ধ্বংসস্তূপে আজ তাহার জীবন্মৃত হৃদয় সুধু দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল আর হাহাকার সম্বল করিয়া পড়িয়া আছে!......তাহার স্মৃতির শ্মশানে আজ সমস্ত অতীত পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে!

জয়ন্ত সকাতরে বলিয়া উঠিল, "ভগবান, চোখ কেড়ে নিলে, কিন্তু এ পোড়া চোখের জল ত তবু শুকাল না—তোমার এ কি অবিচার!"

জয়ন্ত অনেকক্ষণ আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া বসিয়া রহিল। কী যে ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে!

ইন্দুদের বাগান হইতে কোকিল-পাপিয়ার মিলিত কণ্ঠে বাসন্ত-জ্যোৎস্নার বন্দনাগান ফুটিয়া উঠিল। মাঝে-মাঝে বাতাস জাগিয়া তাহার কাণে-কাণে যেন নিষ্ঠুর কৌতুকে বারংবার বলিয়া যাইতে লাগিল, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ!

—"থাম্‌লেন কেন? বলুন!"

—"নিতান্তই শুন্‌বে ইন্দু? তোমাকে এখানে দেখ্‌লে গৌরী কিছু মনে কর্‌তে পারে!"

—"তিনি আর বেশী কি মনে কর্‌বেন? আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তিনি কি তা জানেন না?"

জয়ন্তের মাথা-হইতে-পা-পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিল! বিস্মিত-স্বরে বলিল, "ইন্দু, এ কী বল্‌ছ!"

জয়ন্তের চমকিত বিস্মিত মুখের দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া, ইন্দু প্রশান্তভাবে অবিচল স্বরে বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? যাঁকে স্বামী বলে—"

বিবর্ণমুখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "তুমি এখনো আমাকে বিবাহ কর্‌তে চাও!"

—"কেন চাইব-না জয়ন্তবাবু! আপনাকে ছাড়্‌লে আমি দাঁড়াব কোথায়?"

—"ইন্দু, ইন্দু তুমি কি ভুলে গেছ আমি অন্ধ, রোগে ক্ষতবিক্ষত কুৎসিত?"

নারীর স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া ইন্দুর মুখবন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু সে বুঝিল, আজ যদি সে নীরব হইয়া থাকে, তবে সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাকে এই নীরবতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতএব মনকে শক্ত করিয়া সে বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হবার পর আপনি যদি এমন হ'তেন, তাহ'লে আমি কি আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে পারতুম?"

জয়ন্ত বলিল, "কিন্তু আমাদের বিবাহ ত হয়-নি! তখন তুমি বাধ্য হয়ে যা কর্‌তে—"

জয়ন্তকে মুখের কথা শেষ না-করিতে দিয়াই ইন্দু বলিল, "এখন স্বেচ্ছায় তাই করব! দু'টো মন্ত্র পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাবছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!"

—"তাই যদি হবে ইন্দু, তাহ'লে একটা তুচ্ছ অপবাদ শুনেই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? অপবাদে লোকে কি স্বামীকে ত্যাগ করে?"

ইন্দু বেদনাবদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "বার-বার আপনি খালি ঐ কথাই ভাবছেন! কিন্তু আমি যে স্বাধীন নই, আমার মাথার ওপরে যে বাবা আছেন, সেটা ত একবারও মনে করছেন না!"

—"কিন্তু তোমার বাবা যে অন্ধের হাতে তোমাকে দেবেন না, তুমিও ত সেটা ভাবছ না!"

—"অন্ধ! কী হয়েছে তাতে জয়ন্তবাবু? অন্ধ বলে বাবা আপনাকে ত্যাগ করবেন?—আমি কি বাবাকে চিনি না? এমন মানুষ তিনি নন!"

—"তুমি তোমার মনের কথা বলছ ইন্দু—কিন্তু অন্ধের হাতে কন্যা-সম্প্রদান করতে যে কোন পিতাই সম্মত হবেন না!"

—"জয়ন্তবাবু, বিশ্বাস করুন, আপনি অন্ধ হয়েছেন বলে বাবার মত বদলায়-নি। আমি তা জানি।"

পৃথিবীতে দু'টি জিনিষকে ভোলা যায় না—প্রেম ও মৃত্যু! ইন্দুর কথায় তাই জয়ন্তের মনের বাঁধ একটু-একটু করিয়া ক্রমেই আলগা হইয়া আসিতেছিল—ইন্দুকে সে যে এখনো ভালোবাসে! কিন্তু যে গৌরী তাহার অসহায় রোগশয্যার পাশে বসিয়া দিবারাত্র অনাহারে-অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, প্রাণপণে যে তাহাকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে আর ত সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না! এ যে তাহার মহা কর্ত্তব্য! গৌরীর মুখ ভাবিয়া জয়ন্ত ইন্দুর আশায়

একেবারে জলাঞ্জলি দিল। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট-স্বরে বলিল, "ইন্দু, কেন তুমি আর-দু'দিন আগে আস-নি! মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর হেতু হয়েছি, এখন যার দয়ায় প্রাণে বেঁচে আছি, সেই গৌরীকে ত্যাগ করে' আমি ত মনুষ্যত্ব হারাতে পারব না! সে মহাপাপ কর্‌লে আমার ইহকাল-পরকাল দুই যাবে। ইন্দু, তোমাকে আমি ভালোবাসি— চিরকাল ভালোবাস্‌ব—সেই ভালোবাসা সম্বল করে'ই আমাকে জীবন কাটাতে হবে—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব!"

শুনিতে-শুনিতে যাতনায় ইন্দুর কাণ যেন বধির হইয়া গেল;—মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিল না— আপনার অজ্ঞাতসারেই সে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া জয়ন্তের দুই-পা দুই-হাতে চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বল-স্বরে বলিল, "ওগো, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না!"

প্রেম হচ্ছে বাতির শিখার মত; তখনি সে বেশী-করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, শেষমুহূর্ত্ত যখন কাছে ঘনাইয়া আসে।

ইন্দুর সেই ব্যাকুল আত্মনিবেদনে জয়ন্তের শিরায়-শিরায় তপ্ত রক্ত-প্রবাহ উথলিয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত চিত্ত একেবারে ইন্দুর বুকের উপরে আছড়াইয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল!.........কিন্তু জয়ন্ত প্রাণপণে আপনাকে আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া, অতি কষ্টে অস্ফুট বিদীর্ণ-স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি বাড়ী যাও!"

ঝর-ঝর-ঝর অশ্রুজলে, জয়ন্তের দুই-পা ইন্দু ভাসাইয়া দিল।......

জয়ন্ত তবু পাথরের দেবমূর্ত্তির মত অচল-অটল হইয়া বসিয়া রহিল— বসিয়াই রহিল!

আটাশ

বামুন লুচি বেলিতেছিল এবং গৌরী নিজের হাতে একে-একে সেগুলি ভাজিয়া তুলিতেছিল। বামুনের হাতে জয়ন্তকে খাওয়াইয়া গৌরীর মনের সাধ মিটিত না—রান্নাবান্নার ভার তাই সে আপন হাতে গ্রহণ করিয়াছিল। ভজহরি আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। গৌরীর দিকে হাতের কলিকাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "দিদি-গো, একটু তামুক্ খেতে বাসনা হয়েচে, ধাঁ-করে' অ্যাকটুকরো আগুন দাও-দিকি!"

আগুন দিয়া গৌরী বলিল, "ভজহরি, তুমি ওপরে বাবুর কাছে যাও, তিনি একলা আছেন।"

ভজহরি কলিকাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলিল, "অ্যাক্‌লা থাক্‌বেন ক্যানো, ও-বাড়ীর সেই ঠাক্‌রোণটি যে এয়েচেন!"

চকিতে মুখ ফিরাইয়া গৌরী বলিল, "ও-বাড়ীর ঠাক্‌রুণটি আবার কে?"

—"ঐ যে গো, ইন্দু না বিন্দু—আমার বাছা অত নাম-টাম মুকস্ত-টুকস্ত থাকে না! ঐযে খোকন যাকে বৌ কর্‌বে বলে ক্ষেপেচিল—বুজেচ? তা দ্যাকো দিদিমণি, খোকনের তাকে পচন্দ হ'লে হ'বে কি, মেয়েটা বাপু হদ্দবেহায়া! এই দ্যাকনা, মাঝ্-রাস্তা দিয়ে পায়ে জুতো পরে মদ্দের মত গট্‌মট্ কর্‌তে-কর্‌তে অ্যাক্‌লা আমাদের বাসায় এসে ঢুক্‌ল—যেন ভয়-ডর লজ্জা-সরম কাকে বলে জানে না। ও খেষ্টানি, বুজেচ দিদিমণি, নিশ্চয় যীশু ভজে! ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লো না, তাই রক্ষে,—নৈলে ও খোকনের জাত না-মেরে ছাড়্‌ত না!"—আপনমনে ইন্দুর

সম্বন্ধে তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে-করিতে এবং কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ভজহরি চলিয়া গেল।

গৌরী চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল—শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া! ভজহরির শেষ-কথাগুলোর একটাও তাহার কাণে ঢুকে নাই।

বামুনঠাকুর বলিল, "মা-ঠাকরোণ, কড়া যে জ্বলে যাচ্চে!"

তখন গৌরীর হুঁস্ হইল। তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করিয়া বাকি লুচিগুলো ভাজিয়া তুলিয়া সে বলিল, "ঠাকুর, লুচিগুলো চাপা দিয়ে তুমি একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।"

গৌরীর মনে হঠাৎ একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল—উপরের ঘরটা একবার উঁকি-মারিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য!

উপরে উঠিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া সে জয়ন্তের ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেইখান হইতে দেখিতে পাইল, জয়ন্তকে সে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাতেই সে বসিয়া আছে। তাহার পায়ের কাছে একটি রমণী-মূর্ত্তি—মুখখানি তার হেঁট-করা। চাঁদের আলোয় তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—কিন্তু গৌরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—কে সে!

গৌরী শুনিতে পাইল ইন্দু বলিতেছে—"দু'টো মন্ত্র-পড়া [illegible]ন বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাব্‌ছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!"

—শুনিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে দোল্ খাইয়া দুপ্‌দুপ্ করিয়া উঠিল! .....

তারপরেই জয়ন্ত কথা কহিল। জয়ন্তের কথা শুনিয়া গৌরীর আবার আশা হইল,—অত্যন্ত আগ্রহভরে সেইখানে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া সে দু'জনের কথা শুনিতে লাগিল।

কিন্তু, ইন্দুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেও, জয়ন্ত কাতর-স্বরে যে কথাগুলি বলিল, তাহা শুনিয়া গৌরীর মনে হইল, কে-যেন তাহার কাণের ভিতরে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া দ্রবীভূত অগ্নির ধারা ঢালিয়া দিল। আদালতে দাঁড়াইয়া আসামী যখন বিচারকের মুখ হইতে ফাঁসীর হুকুম শোনে,—গৌরীর অবস্থা তখন ঠিক সেইরকম!

এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে গৌরী বুঝিতে পারিল, জয়ন্ত তাহাকে গ্রহণ করিবে সুধু কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হইয়া,—জয়ন্তের প্রাণ তাহার প্রতি একান্ত বিমুখ!......সে যদি জয়ন্তকে বিবাহ করে, তাহাহইলে অন্ধ জয়ন্তের নিরানন্দ জীবন চিরদিন ব্যর্থপ্রেমের হতাশ হাহাকারে ভরিয়া থাকিবে—তাহার বাহিরের দেহ এবং ভিতরের মন দুইই একসঙ্গে সমান-অসার্থক হইয়া যাইবে!......

গৌরী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অপার ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ওদিকে জয়ন্তের পায়ে পড়িয়া অভাগী ইন্দু অনেকক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলিল, কিন্তু জয়ন্তের কঠোর মৌনব্রত কিছুতেই আর ভঙ্গ করিতে পারিল না; দুই-হাতে মুখ ঢাকিয়া অভিভূতের মত বসিয়া, জয়ন্ত আপনার বুকের তুফান বুকের ভিতরেই চাপিয়া রাখিল। ইন্দুর চোখের প্রতি অশ্রুবিন্দু তাহার পায়ের উপরে পড়িতেছে, আর জয়ন্তের মনে হইতেছে, তাহার কঙ্কাল হইতে যেন এক-একখানা হাড় খসিয়া-খসিয়া সেই অশ্রু-সাগরে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে!

অবশেষে ইন্দু বারান্দার রেলিং ধরিয়া, আপনার অবশ দেহটাকে কোনমতে টানিয়া দাঁড় করাইল। তারপর আস্তে-আস্তে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি নিয়তির চেয়েও নিষ্ঠুর! আপনি ভালো থাকুন সুখে থাকুন—এই আমার শেষ-কামনা।"

জয়ন্ত তেম্‌নি মূক হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

নয়নাগ্রে সমস্ত প্রাণ একাগ্র করিয়া, জয়ন্তের দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ইন্দু ধীরে-ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে দেখাইতেছিল ঠিক যেন একখানি জীবন্ত বিষাদ-প্রতিমার মত!

তাহার পদশব্দে জয়ন্ত চমকিয়া মুখ তুলিল—পাগলের মত সাম্নে দুই-হাত বাড়াইয়া, ক্রন্দনভরা-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইন্দু, ইন্দু!"

ইন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—"তোমার চোখের জল আমার পা থেকে ইহজীবনে আর শুকবে না—ইন্দু, এ অভাগাকে ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো!"

ইন্দু কলের পুতুলের মত দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্ত আবার বলিয়া উঠিল, "যেও-না ইন্দু, যেও-না—যেও-না!"

ইন্দু আবার দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন জয়ন্তবাবু!"

—"না, না, কিছু বল্‌ছি-না,—তুমি যাও, তুমি যাও"—বলিতে-বলিতে জয়ন্ত মূর্চ্ছিতের মত টলিয়া মাটির উপরে হেলিয়া পড়িল।

সে পতনশব্দ শুনিয়া ইন্দু ও তাহার পিছনে-পিছনে গৌরী তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া আসিল।

গৌরীকে দেখিয়াই ইন্দুর মুখ শুকাইয়া পাংশু হইয়া গেল—থমত খাইয়া পায়ে পা বাধিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৌরী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—একেবারে জয়ন্তের পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু গৌরী কোন সাহায্য করিবার আগেই জয়ন্ত দুই-হাতে ভর দিয়া আবার উঠিয়া বসিল।

গৌরী তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া ভীত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোথায় লেগেছে?"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "গৌরী! তুমি কোত্থেকে এলে?"

গৌরীর মুখে মিথ্যা কথা বাধিয়া গেল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি এইখানেই ছিলুম।"

—"এইখানে ছিলে! কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ।"

—"ইন্দু—ইন্দুকে—"

—"হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি!—" ফিরিয়া ইন্দুর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া গৌরী আবার বলিল, "এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

—"ইন্দু! ইন্দু এখনো আছে!"

—"তোমার কোথায় লেগেছে বল-না?"

—'কোথাও লাগে-নি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যাওয়াতে পড়ে গিয়েছিলুম।…অনেক রাত হ'ল ইন্দু, এবার তুমি বাড়ী যাও!"

ইন্দু দরজার দিকে ফিরিতে-না-ফিরিতে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। কোমল-স্বরে বলিল, "তুমি কোথা যাও বোন্!"

ইন্দু অবাক্ হইয়া গৌরীর মুখের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গৌরী একটুখানি ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিল, "উনি যেতে বল্ছেন বলেই তুমি অম্‌নি চল্‌লে দিদি? এত সহজে কি নিজের পাওনা ছাড়তে আছে ভাই! যা আদায় কর্‌তে এসেছ জোর করে' তা আদায় করে' নিয়ে যাও!"

আরো-বেশী ব্যস্ত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "ইন্দুকে যেতে দাও গৌরী, রাত হয়ে যাচ্ছে যে!"

সে কথায় কাণ না-দিয়া ইন্দুকে জোর-করিয়া একখানা চেয়ারে

বসাইয়া গৌরী বলিল, "যে সংসারে আর দু'দিন পরে তুমি ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বস্‌বে, এরি-মধ্যে সেখান থেকে পালাই-পালাই কর্‌লে চল্‌বে কেন ?"

ইন্দু হতভম্ব হইয়া মাথা তুলিল, এ নির্দ্দয়া কি তাহার দুঃখে বিদ্রূপ করিতেছে ?

জয়ন্ত বুঝিল, গৌরী সব দেখিয়াছে, সব শুনিয়াছে! মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া সে বলিল, "গৌরী, যা তা কী বল্‌ছ ?"

গৌরী ধীর শান্ত-স্বরে বলিল, "যা তা কিছুই বল্‌ছি না।"

—"গৌরী !"

—"না, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমাকে এঁর হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যাব !"

—"দেশে ফিরে যাবে ?"

—"হ্যাঁ, দেশে।"

—"আমি ত সে কথা বল্‌ছি না গৌরী! তুমি দেশে ফিরে যাবে কেন ?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া গৌরীর কান্না আসিতেছিল,—কোনক্রমে অশ্রু বেগ সাম্‌লাইয়া সে বলিল, "আমার ত আর-কোথাও ঠাঁই নেই !"

—"গৌরী, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে চাও ?"

—"না, তোমার কষ্ট হবার ভয়েই আমি দেশে ফিরে যাব !...... চোখ হারিয়ে তুমি যে যন্ত্রণা দিন-রাত ভোগ কর্‌ছ, তার ওপরে যদি আবার মনের সুখও হারাও, তবে তুমি বাঁচ্‌বে কেমন করে' ?" বলিতে-বলিতে দুঃখের আবেগে গৌরীর গলা ধরিয়া আসিল ; একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তোমার চেয়ে আপনজন আমার কেউ নেই গো, কেউ নেই ! কিন্তু নিজের সুখের জন্যে আমি যদি তোমার দরদ না-